ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

জুলাই ২০১৫ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ১০

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নবদিগন্ত

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে উদ্যমের নবীকরণ
অচল মালহোত্রা

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক
কে সি সিং

আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে ভারতের অর্থনৈতিক কূটনীতি
ড. রাম উপেন্দ্র দাস

জোট সরকারের জমানায় সুপ্রশাসনের অনন্য নজির
ড. এ সূর্য প্রকাশ

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

SOME IMPORTANT TITLES OF PUBLICATIONS DIVISION

1. The Economic History of India—Vol-One	175.00
2. The Economic History of India—Vol-Two	260.00
3. Babu Jagjivan Ram	132.00
4. Conscience of the Race—India's Off-beat Cinema	240.00
5. Indian Navy—a Perspective	300.00
6. Growing Fruits and Vegetables	240.00
7. Children in India—A Legal Perspective	75.00
8. Indian Railways—Glorious 150 years	250.00
9. Media Ethics	100.00
10. The Story of India's Struggle for Freedom	75.00
11. India In the Space Age	235.00
12. Folk Arts and Social Communication	125.00
13. Aspects of Indian Music	60.00
14. A Brief History of Water Resources in India	70.00
15. The Charkha and the Rose	75.00
16. Ramananda Chattopadhyay	75.00
17. R. N. Tagore	95.00
18. Some Eminent Indian Scientist	125.00
19. Subhas Chandra Bose	100.00
20. Khudiram Bose (Beng.)	75.00
21. Indian Civilisation and the Science of Fingerprinting	160.00
22. Story of INA	35.00

Available at :

SALES EMPORIUM :
8, Esplanade East ; Kolkata-700 069
Ph. : 2248-6696, 2248-8030

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

JULY, 2015
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

জুলাই, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে উদ্যমের নবীকরণ — অচল মালহোত্রা ৫
- ভারত-মার্কিন সম্পর্ক — কে সি সিং ১০
- আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে ভারতের অর্থনৈতিক কূটনীতি — ড. রাম উপেন্দ্র দাস ১৪
- জোট সরকারের জমানায় সুপ্রশাসনের অনন্য নজির — ড. এ সূর্য প্রকাশ ১৭
- ‘পুবে কাজ কর’—এখন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া — ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২২
- বহুপাক্ষিকতার পশ্চাদপসরণ — দিলীপ সিনহা ২৭
- ভারত ও তার প্রতিবেশীরা — স্নেহাশিস সুর ৩০
- প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের হাত ধরে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়া সম্পর্কের সূচনা — অলোক বনশল ৩৪
- সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মোদী সরকারের বিদেশ নীতি — অনিন্দ্য জ্যোতি মজুমদার ৩৮
- ভারত-চীন সম্পর্ক : রূপান্তরিত বন্ধন — মণীশ চাঁদ ৪২

বিশেষ নিবন্ধ

- সহযোগী যুক্তরাষ্ট্র, স্থানীয় শাসন ও ভারতের চতুর্দশ অর্থ কমিশন — উৎপল চক্রবর্তী ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৫২

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

ভারতের উত্থান

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের মতে একটি রাষ্ট্রের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ তার সামরিক শক্তির থেকেও কূটনৈতিক সাফল্যের উপরই বেশি নির্ভরশীল। এই কথা ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একদিকে আমাদের দেশপ্রেম সর্বজনবিদিত, অন্যদিকে শান্তি-কামী রাষ্ট্র হিসেবেও বিশ্বে আমাদের সুনাম ক্রমশ বাড়ছে। তাছাড়াও, সীমান্তরক্ষায় লিপ্ত আমাদের উর্দিধারী ভাইয়েদের আমরা সব সময় সম্মান করেছি। তবে, এর আগে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যের দিকটি মানুষের কাছে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়নি। এখন অবশ্য এই পন্থার পরিবর্তন হচ্ছে। মূলস্রোতের গণমাধ্যমগুলি এ বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সে কারণেই ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কূটনীতির সমস্ত মারপ্যাঁচ ও কূটনৈতিক পরিভাষার খুঁটিনাটি পুরোপুরি না বুঝতে পারলেও, রাষ্ট্র-হিতে কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব তাঁরাও উপলব্ধি করতে পারছেন।

উদারীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দ্রুত পরিবর্তন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতকে এক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে। এক অন্তরমুখী অর্থনীতি থেকে বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত ও সাফল্য আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিগত এক বছরে আমাদের কূটনৈতিক পদক্ষেপগুলিও বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছে। অত্যন্ত সতর্ক বা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থান ছেড়ে ভারতীয় কূটনীতি আজ জোরকদমে এগোচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্ক-ভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানান এবং সেই দিন থেকেই তাঁর কূটনৈতিক লক্ষ্যে পথ-চলা শুরু। কূটনীতির বিশেষজ্ঞরা তাঁর এই পদক্ষেপকে ওস্তাদের মার আখ্যা দিয়েছেন। মাত্র এক বছরের মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল মিলিয়ে মোট ১৯টি দেশে প্রধানমন্ত্রীর সফর আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নবদিগন্তের উন্মোচন করেছে। এই বছরে সীমান্ত-সংলগ্ন প্রতিবেশী-রাষ্ট্রগুলিসহ সন্নিহিত অঞ্চলে ভারতের তৎপরতা আরও বেড়েছে। বিশ্বের সব প্রধান শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও দেশগুলির সঙ্গে আমাদের কৌশলগত সম্পর্ক আরও চাঙ্গা হয়েছে। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত নেপালে উদ্ধারকাজের জন্য অবিলম্বে সাড়া দিয়ে ভারত সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। বহু বছর ধরে রাষ্ট্রসংঘের শান্তি-রক্ষা অভিযানে আমাদের অবদান অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

যোজনা

অন্যান্য দেশে অনাবাসী ভারতীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত সম্প্রদায়ের উপস্থিতি (সারা বিশ্বে মোট সংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় বৃহত্তম) এই সব দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে এ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় দেশগুলিও এখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ও দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি (চীন-কে টপকে) হওয়ার পাশাপাশি, ভারত উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন বৃহত্তম মানব-সম্পদের অধিকারী—এই কারণেই অন্যান্য কোনও দেশের পক্ষে ভারতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

অর্থনীতি, মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য গোটা বিশ্বকে রীতিমতো বাধ্য করেছে জাতি হিসাবে আমাদের মতামত ও বক্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ ২০১৫ সাল থেকে ২১ জুন-কে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে পালন করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর পাশাপাশি, এই সময়কালে আন্তর্জাতিক স্তরেও ভারতের প্রতি প্রত্যাশা ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন নতুন নীতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভারত অবশ্য এই সব চ্যালেঞ্জেরই মোকাবিলা করতে পেরেছে। সেই ১৯৪৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত নিরন্তর প্রয়াসের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের দরবারে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে যোগ্য স্থান অধিকার করেছে। আমরা আশা করি যে খুব শীঘ্রই ভারত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তার বহু-বিলম্বিত প্রাপ্য স্থায়ী সদস্যপদ অর্জন করবে।❑

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে উদ্যমের নবীকরণ

নতুন দিগন্তের উন্মোচন

শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সন্নিহিত অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় থাকা পূর্ব-শর্ত। এ কথাটা যেমন ব্যক্তিবিশেষের জন্য পাড়া-পড়শির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনই যে কোনও দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতীয় উপমহাদেশের সব ক'টি দেশের সঙ্গে ভারতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক তথা আন্তর্জাতিক আঙিনায় কূটনৈতিক সমীকরণ বিগত এক বছরে কীভাবে নয়া মোড় নিয়েছে, আলোচনা করছেন **অচল মালহোত্রা।**

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর নতুন দিল্লিতে একটি স্থায়ী এবং শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকারের তরফে আন্তর্জাতিক স্তরে, যার মধ্যে প্রতিবেশী দেশগুলিও রয়েছে, বার্তা পাঠানো হয় যে ভারতকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার সময় এসেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির বিষয়গুলি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী গত এক বছরে উনিশটি দেশ সফর করেছেন, এছাড়া নতুন দিল্লিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। এভাবে তিনি পৃথিবীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন, তা সে দ্বিপাক্ষিক স্তরেই হোক অথবা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক স্তরেই হোক।

সরকারের কূটনৈতিক কার্যকলাপ থেকে এখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে 'প্রতিবেশীরাই প্রথম' (নেবারহুড ফার্স্ট) এই নীতি নিয়েই সরকারের বিদেশ নীতির অগ্রাধিকারের তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এমনকী মাননীয় মোদী প্রথাগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই প্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছানোর উদ্যোগ শুরু করেন। গত বছর ২৬ মে প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে সমস্ত সার্কভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের তিনি আমন্ত্রণ জানান। এই অভূতপূর্ব নিমন্ত্রণ প্রক্রিয়া, এক সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে দেশের রাজনীতির নতুন কর্ণধার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে এবং এলাকার একাত্মকরণের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুষ্ঠানে এই সব প্রতিবেশী দেশ ও সরকারের প্রধানদের উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে তাঁরাও ভারত সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং অনুরূপ সাড়াও দিচ্ছে। প্রারম্ভিক সম্পর্ক নির্মাণ করতে এই অনুষ্ঠান চমৎকার সুযোগ তৈরি করে দেয়, পরে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে আলোচনাকক্ষের বাইরে পারস্পরিক সাক্ষাৎকার এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বছরের সফরসূচির মধ্যে ছিল সার্কভুক্ত (সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন) সাতটি দেশের মধ্যে চারটি দেশ (ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ) এবং চীন। রাজনীতি, সুরক্ষা এবং কৌশলগত পরিস্থিতি এমন যে সার্কভুক্ত বাকি তিনটি দেশ (আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ) সফর করতে প্রধানমন্ত্রীর আরও কিছুটা সময় লেগে যেতে পারে। ইতিমধ্যে আফগান রাষ্ট্রপতি এ বছর এপ্রিল মাসে ভারতে এসেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী পাকিস্তান এবং মালদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে নতুন দিল্লিতে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় সাক্ষাৎ করেছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় এক বছর সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে অন্তত একবার সাক্ষাৎ করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করেছেন একাধিকবার।

এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা কী আকার ধারণ করবে তা আলোচনার আগে আঞ্চলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কম করে হলেও বলা চলে দক্ষিণ এশিয়া হল এক জটিল অঞ্চল বিশেষ। অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে ঐতিহ্য ও ইতিহাস। একই সময়ে তাদের মধ্যে ধর্ম, জাতি, ভাষা এবং রাজনীতিগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া রক্তক্ষয় ও গৃহযুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চল দেখেছে মুক্তি আন্দোলন, পারমাণবিক প্রতিযোগিতা, সেনাবাহিনীর একনায়কত্ব। এবং এখনও দেখে চলেছে বিদ্রোহ, ধর্মীয় মৌলবাদ এবং উগ্রপন্থা। এছাড়াও মাদক ও মানব পাচারের সমস্যা তো রয়েছে। ধর্মীয় সহনশীলতার মাপকাঠিতে দেখা যায় দেশগুলি নমনীয় ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে কঠোর মৌলবাদের মধ্যে অবস্থান করছে। বলা হয় দক্ষিণ এশিয়া হল এমন একটা অঞ্চল যেখানে পারস্পরিক একাত্মকরণের কাজটা হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। তিরিশ বছর পার হয়ে গেলেও সার্ক এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সরকারগুলিই কিছুটা লাভবান হতে পেরেছে এবং কয়েকটি দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ভবিষ্যতের জন্য অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এই অঞ্চলে ভারতের অবস্থান কোথায়? আকার ও জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত হল বৃহৎ সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যকরী রয়েছে এবং অর্থনীতি আপেক্ষিকভাবে শক্তপোক্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তিরও উন্নতি ঘটেছে। এবং বর্তমানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত বলে মনে করা হচ্ছে। ফলত এমন একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে যে ভারত যেন অন্য দেশগুলিকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করছে। তাছাড়া ভারতের আকৃতি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে ছোট ছোট প্রতিবেশী ভুলক্রমেই ভাবছে যে ভারত 'বড়ভাই' বা 'দাদা' (বিগ ব্রাদার)-র মতো আচরণ করছে। অনেক সময় কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ আবার 'চীনা তাস' খেলার কথা বিবেচনা করছে এই আশায় যে তারা ভারতের কাছ থেকে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে।

কাঠমান্ডুতে সার্ক সম্মেলনে (২৬ নভেম্বর ২০১৪) প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি খোলাখুলি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই অঞ্চলের জন্য আমাদের নীতি পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে: বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সহায়তা, প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আর সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ। যারা এই প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নবজাগরণ' শুরু হয়েছে এবং সার্কভুক্ত দেশগুলির একাত্মবোধ পুনরুজ্জীবিত হতে বাধ্য। তিনি আরও বলেন : 'এগুলি ঘটতে পারে সার্কের ভেতর থেকে অথবা বাইরে থেকে, সার্কভুক্ত দেশগুলির সমস্ত সদস্যদের মধ্যে অথবা তাদের কয়েকটির মধ্যে।'

এখন দেখা যাক আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের রূপ কী আকার ধারণ করছে।

ভুটান

এই হিমালয় রাজ্যটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চমৎকারভাবে লালিত হয়েছে এবং বলা যায় এটি একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বৈদেশিক সফরের (১৫-১৬ জুন, ২০১৪) প্রথম দেশ হিসেবে ভুটানকে বেছে নেওয়া থেকেই তা প্রমাণিত হয়। বার্তাটি ছিল বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে ভারত যে ভুটানকে কতটা গুরুত্ব দেয় সেটাই পুনরায় প্রমাণ করা। সফরের সময় আশাপ্রদভাবেই জোর দেওয়া হয়েছিল উন্নয়নমূলক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক যোগসূত্রের ওপর। ভুটান তাদের ১৯৬১ সাল থেকে শুরু হওয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ভারত থেকে যে সহযোগিতা পেয়ে এসেছে সে ব্যাপারে অনেক প্রশংসা করে। ভুটানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতায় লাভবান হয়েছে উভয় দেশই এবং অন্যান্য দেশের কাছেও এই প্রকল্প মডেল হিসেবে উঠে আসছে, বিশেষত নেপালের কাছে বিষয়টি অনুকরণীয়। ভুটানের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গড়ে তুলতে ভারত সহায়তা করেছে; ভারত নিজের দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে ভুটান থেকে বিদ্যুৎ কিনছে এবং ভুটানও এভাবে বড় অঙ্কের রাজস্ব নিজেদের কোষাগারে তুলতে পারছে। অতীতে ভুটান ২০০৩ সালে ভারত-বিরোধী বিদ্রোহীদের তাদের এলাকা থেকে হটিয়ে দেয় এবং ভারতকে নিশ্চয়তা দেয় যে তারা তাদের ভূখণ্ডকে কখনওই এমন কোনও কাজের জন্য ব্যবহার করতে দেবে না যা ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী; প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের সময় এই আশ্বাসের কথা পুনরায় তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা উত্থান-পতনের, যদিও তারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ভূমিকাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রশংসা করে। যেখানে শেখ হাসিনার পরিচালিত আওয়ামি লিগ দলকে ভারতের প্রতি নরম মনোভাবাপন্ন বলে বিবেচনা করা হয়, বেগম খালেদা জিয়ার পরিচালিত বাংলাদেশ জাতীয় দল (বিএনপি) এবং বাংলাদেশ জামাত-এ-ইসলামি—এই দুটি দল ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কট্টরপন্থী। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশ শাসনের দায়িত্ব বর্তেছে বিএনপি অথবা আওয়ামি লিগ পরিচালিত সরকারের ওপর এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা যথাক্রমে কখনও উন্নতির দিকে এগিয়েছে, আবার কখনও বা নিশ্চল থেকেছে। সময়ে সময়ে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ দানা বেঁধেছে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঘটেছে বেআইনি অনুপ্রবেশ, যার ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, অমীমাংসিত সীমানা এলাকায় চলেছে চোরাচালান, উভয় দেশে প্রবহমান নদীগুলির জলবণ্টন প্রক্রিয়া অমীমাংসিত থেকেছে, বিশেষত তিস্তার জলবণ্টনের বিষয়টি। অন্য দিকে বিগত বছরগুলিতে শেখ হাসিনার সরকার ভারতের সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগকে ভালোভাবেই প্রশমিত করেছে; কিন্তু বাংলাদেশে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বিনিময়ে তারা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের ঠিক এক বছর পূর্ণ হবার পরই বাংলাদেশ সফর করেন (জুন ৬-৭, ২০১৫)। দু'দেশের স্থলসীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তিটি সম্পন্ন করাই ছিল এই সফরের মূল উদ্দেশ্য, চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়েছিল সেই ১৯৭৪ সালে, কিন্তু ভারতে পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন সরকার নানা কারণে চুক্তিটিকে লোকসভায় পাশ করাতে পারেনি, এই সব কারণের মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকারগুলির বিরোধিতা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম থেকে এই বিরোধিতার মাত্রা ছিল অনেক বেশি। যেভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মতামতকে সংহত করে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৭৪ সালের চুক্তির স্বপক্ষে ১০০তম সংবিধান সংশোধনী বিল এবং এর ২০১১ সালের প্রোটোকল লোকসভায় উভয় কক্ষে পাশ করালেন তা সবিশেষ প্রশংসনীয়। স্থলসীমান্ত চুক্তি কেবলমাত্র দু'দেশের মধ্যে ৪,০৯৬ কিলোমিটার স্থলসীমার মীমাংসাই করল না এবং ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ৫০,০০০ মানুষকে নতুন পরিচিতিই দিল না, এর ফলে আরও অনেকগুলি দিগন্ত উন্মুক্ত হল যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপ, বিশেষ করে মানব পাচার, বেআইনি অনুপ্রবেশ, চোরাচালান প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে সীমান্ত পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

এই সফরে বাংলাদেশের তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হল বাণিজ্য এবং ভ্রমণের লক্ষ্যে তাদের ভূখণ্ড ভারতকে ব্যবহার করার

অনুমতি দেওয়া। এর ফলে দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের সঙ্গে অন্যান্য অংশের যোগাযোগ সহজ হবে—এতদিন তা নির্ভরশীল ছিল সরু এবং অরক্ষিত শিলিগুড়ি করিডোরের ওপর। এই করিডোরকে সাধারণত 'চিকেন নেক' (মুরগির গলা) নামে অভিহিত করা হয়। ঢাকা-শিলং-গুয়াহাটি এবং কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস পরিষেবা এই অঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। অনুরূপভাবে উপকূল নৌ-চুক্তি মাল-বোঝাই জাহাজ চলাচলের সময়সীমা অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারবে, এছাড়া সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলি তো রয়েছে। একই রকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং মঙ্গলা বন্দর ব্যবহার করতে দেওয়ার লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে মৌ (চুক্তি) স্বাক্ষরিত হওয়া। তাৎপর্য-পূর্ণভাবে বাংলাদেশ এই পরিবহণ চুক্তির সঙ্গে তিস্তা চুক্তির বিষয়ে কোনও শর্ত আরোপ করেনি।

বাংলাদেশের উচিত তাদের দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারতের বিনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়া, কারণ এর ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমবে ও সে দেশের কর্মসংস্থানও বাড়বে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে দেওয়া ভারতের দু'বিলিয়ন ডলার ঋণ তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করতে সাহায্য করবে, বিশেষ করে গণপরিবহণ, রাস্তা, রেল, অভ্যন্তরীণ জলপথ, বন্দর, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্র এবং এর ফলে ভারতের পণ্য, প্রকল্প এবং পরিষেবা রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বর্তমানে গুণগতভাবে এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। সম্পর্কের স্থিতিশীলতা এখন পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সফর ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক গুচ্ছ আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করেছে, যেমন জলসম্পদের বণ্টন, শক্তিক্ষেত্র (অসামরিক পারমাণবিক শক্তি), মহাকাশ, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ যার মধ্যে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা দূর করা ও বাংলাদেশে ভারতের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে কার্যকর করা। এছাড়াও রয়েছে দু'দেশের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বহুমাত্রিক যোগাযোগ, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো এবং অন্যান্য বিষয়। সর্বোপরি এই সফর বাংলাদেশে ভালোরকম আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে ভারতের প্রতিশ্রুতি পালন করার ক্ষমতা রয়েছে।

আফগানিস্তান

বিগত কয়েক বছর যাবৎ আফগানিস্তান কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। সুরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা ভারতের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। ন্যাটোর সেনাবাহিনীকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনটা সহজ হয়নি। তালিবানদের প্রত্যাবর্তন ভারতের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আফগানিস্তানের এমন এক শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন হতে চলেছে যাকে পাকিস্তানের 'প্রতিনিধি' (প্রক্সি) বলা যায়—মৌলবাদীদের দ্বারা পরিচালিত ও ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী। গত বছর সেপ্টেম্বরে ক্ষমতায় আসার পরই আফগানিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আসরফ ঘানি এমন একটা ধারণা তৈরি করেছেন যেখান থেকে মনে হয় তাঁর বিদেশ নীতির অগ্রাধিকারের তালিকায় ভারতের স্থান নীচের দিকে। তিনি ভারত সফরে এসেছেন ক্ষমতায় আসার অনেক পরে (এপ্রিল ২৮-২৯, ২০১৫)। এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে তিনি এই অঞ্চলের অন্য দুটি দেশ সফর করেন, যেমন চীন ও পাকিস্তান; এছাড়াও অঞ্চলের বাইরে তাঁর সফরের মধ্যে রয়েছে আরও দুটি দেশ—ইংল্যান্ড এবং সৌদি আরব। স্বাভাবিকভাবে ভ্রু-কোঁচকানো শুরু হয়েছে এবং ভারতে প্রশ্নও উঠে আসছে তাহলে কি আফগানিস্তানের বিদেশ নীতি ভারতকে পরিহার করে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকছে। ভারত-সফরের সময় আফগান রাষ্ট্রপতি সচেতনভাবেই এই ধারণা দূর করতে সচেষ্ট হন। যখন ভারতের একটি টিভি চ্যানেল এনডিটিভি-র তরফে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তাঁর এই বিদেশ ভ্রমণের সময়ের সঙ্গে কোনও অগ্রাধিকারের বিষয়টি রয়েছে কি না, আফগান রাষ্ট্রপতি কৌতুকের সঙ্গে দারিভাষার একটি জনপ্রিয় প্রবাদের উল্লেখ করেন, "দের আয়েদ, দুরুস্ত আয়েদ" (বেটার লেট দ্যান নেভার)। যেন এ বিষয়ে ভীতি দূর করতে ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ইস্যু করা যৌথ বিবৃতিতে এক ইঙ্গিতবাহী প্রসঙ্গ তিনি যুক্ত করেন যেখানে বলা হয় অঞ্চলের শান্তি, উন্নয়ন এবং সুরক্ষা অবিভাজ্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্মানের সম্পর্ক অন্য দেশগুলির অথবা অন্য দেশগুলির সমষ্টির (গ্রুপ অব নেশন্স) পরিপন্থী হয়ে গড়ে উঠবে না। একই বিবৃতিতে আফগান রাষ্ট্রপতি আফগানিস্তানের প্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিটির পুনরাবৃত্তি করেন এবং সত্য ঘটনাটা হল আফগানিস্তানের বিদেশ নীতির অগ্রাধিকারের পাঁচটি বৃত্তর মধ্যে ভারতের স্থান চতুর্থ।

এ ধরনের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বক্তব্য সত্ত্বেও ভারতের নেতৃবৃন্দ আফগানিস্তান এবং আশপাশের ঘটনাবলির ওপর নজর রাখার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, কারণ আফগানিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং তার বন্ধুত্ব ভারতের নিজের স্বার্থেই জরুরি। দ্বিপাক্ষিকভাবে ভারত আফগানিস্তানের সঙ্গে এক কৌশলগত অংশীদারিত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এবং আফগানিস্তানকে দু'কোটি বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই অর্থ দিয়ে তারা পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাবে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করবে, ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে যার মধ্যে থাকবে আফগান সেনাদের প্রশিক্ষণের মতো বিষয়ও। আফগানিস্তানের স্থায়িত্বের স্বার্থেই ভারতের এই সহায়তা এবং বিষয়টি ভারতের অগ্রাধিকারের তালিকার ওপরের দিকেই রয়েছে।

পাকিস্তান

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের পরিস্থিতি বরাবরই স্বাভাবিকের চেয়ে নীচেই থেকেছে। এই দুটি দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ১৯৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১ সালে এবং পরবর্তীকালে ১৯৯৯ সালে (কার্গিল)। সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। কখনও কখনও সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালানো

হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই আবার আগের অবস্থাতেই ফিরে এসেছে।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার সময় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। গত বছর মে মাসে প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পাকিস্তান-সহ বিভিন্ন সার্কভুক্ত দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ বরফ গলার একটা সুযোগ এনে দেয়। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ আনুষ্ঠানে হাজির হন এবং সে সময় তিনি বিদেশ সচিব পর্যায়ে আলোচনা শুরু করতেও রাজি হন। গত বছর আগস্ট মাসে ভারতের বিদেশ সচিবের ইসলামাবাদ যাত্রার প্রাক্কালে নতুন দিল্লিতে পাকিস্তানের হাইকমিশনের তরফে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনায় বসার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত এই সফর বাতিল করে। ঘটনাটাকে ভারত সরকার অত্যন্ত গুরুতর বলে দাবি করে, যদিও পাকিস্তানি হাইকমিশনের তরফে এভাবে আলাপ-আলোচনা চালানোটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। ভারতের তরফে এ ব্যাপারে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়: 'পাকিস্তানের হাইকমিশনের তরফে তথাকথিত হুরিয়ত নেতাদের আমন্ত্রণ পাকিস্তানের আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে—এর থেকেই স্পষ্ট যে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা এখনও অব্যাহত। সুতরাং বর্তমান ঘটনার প্রেক্ষিতে মনে করা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে ভারতের বিদেশ সচিবের ইসলামাবাদে গিয়ে আলোচনা করলে কোনও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না।' এর পর আরও একবার গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক আঙিনায় টেনে নিয়ে যাবার ঘটনায় পরিবেশ আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তিতে পাকিস্তান কাশ্মীরকে দ্বিপাক্ষিক ইস্যু হিসেবে মেনে নিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিল।

তথাকথিত সার্ক যাত্রার অঙ্গ হিসেবে এবং কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী দু'দেশের মধ্যে ক্রিকেট খেলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বিদেশ সচিবকে পাকিস্তানে পাঠানোর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে (৩ মার্চ, ২০১৫) সমালোচকরা দেশের কাশ্মীর নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে ৩১ মে ২০১৫ তারিখে নতুন দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের কাছে বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অস্বীকার করেন যে দেশের পাকিস্তান নীতিতে কোনওরকম পালটি খাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন আলোচনা চালানোর জন্য তাঁর সরকার একেবারে প্রথম থেকেই তিনটি মাপকাঠি বেছে নিয়ে এ বিষয়ে পাকিস্তানকে বারবার জানিয়েছে—ভারত কোনওরকম বিচ্যুতি ছাড়াই সর্বতোভাবে এই মাপকাঠি বা নীতি মেনে এগিয়েছে। প্রথম নীতি, সমস্ত ইস্যু শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আলোচনা হবে শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এবং কোনও তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সেখানে মেনে নেওয়া হবে না। সর্বশেষ নীতি, আলোচনা এবং কথাবার্তা চালাতে হবে সিমলা চুক্তি এবং লাহোর ঘোষণার প্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে।

যদিও এখনও দেখার বাকি ভবিষ্যতে কী হবে, কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলতে হয় সমস্যার মূল কারণ কাশ্মীর নয়; আসল কারণ হল পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রটি বহুবিধ : রয়েছে শক্তিশালী সেনাবাহিনী, প্রভাবশালী আইএসআই, মৌলবাদী শক্তি ও বিভিন্ন লবি এবং রয়েছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কিন্তু ভঙ্গুর এক সরকার। ভারতের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে যতক্ষণ না ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থিত সকলের মধ্যে সহমত গড়ে ওঠে, ততক্ষণ এ ব্যাপারে কোনও বাস্তবিক উন্নতি ইচ্ছাবিলাস হয়েই থাকবে।

শ্রীলঙ্কা

২০০৯ সালে এলটিটিই অপসারণের পর শ্রীলঙ্কার বিষয়ে ভারত বহুমুখী নীতি নিয়ে চলেছে এবং এই নীতির বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলি হল :

(১) শ্রীলঙ্কা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা শ্রীলঙ্কার তামিলদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করে, বিশেষ করে ক্ষমতার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীটি রূপায়িত করে;

(২) শ্রীলঙ্কার তামিলদের বিভিন্ন সময়ে ভারতের তরফে যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে, যাতে কোনওভাবেই ১৩তম সংশোধনীকে লঘু করা না হয় এবং শ্রীলঙ্কার তামিল সম্প্রদায়ের মানুষদের ভবিষ্যতে সমতা, সুবিচার ও আত্মসম্মান সুনিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ;

(৩) উত্তর শ্রীলঙ্কার পুনর্গঠনে বিনিয়োগ করা, কারণ এই এলাকাটি দীর্ঘ দিন ধরে চলা গৃহযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত;

(৪) ভারতের তামিল নেতৃবৃন্দের দাবিগুলি যথাসম্ভব পূরণ করে, কিন্তু আখেরে সরকার সীমান্ত এলাকায় জাতীয় স্বার্থের কথাই মাথায় রেখে (ক্ষুদ্র আঞ্চলিক অগ্রাধিকারের বিষয়টি দূরে সরিয়ে) বিদেশ নীতি প্রণয়ন করবে;

(৫) শ্রীলঙ্কা-চীন আলাপ-আলোচনার বিষয়টির ওপর নজর রাখা এবং খতিয়ে দেখা শ্রীলঙ্কা কতটা চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে;

(৬) মৎস্যজীবীদের ইস্যুগুলির নিরসন করা।

দুর্ভাগ্যের বিষয় শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মাহিন্দ্র রাজাপক্ষ, প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, শ্রীলঙ্কার সংখ্যালঘু তামিলদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেননি। তার ওপর আবার তিনি 'চীনা তাস' খেলতেও শুরু করেছিলেন। তাঁর চীন-অনুকূল নীতির ফলস্বরূপ শ্রীলঙ্কা চীনকে তাদের দেশে প্রতিরক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থলে ঘাঁটি গাড়তে অনুমতি দেয়। এলটিটিই-র সঙ্গে যুদ্ধে শ্রীলঙ্কার তরফে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে মানব অধিকার সংক্রান্ত যে প্রস্তাব (ইউএন হিউম্যান রাইট্স্ কাউন্সিল রেজোলিউশন) গৃহীত হয়েছিল সেখানে ২০১২ এবং ২০১৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারত ভোট দেয় এবং বিষয়টি শ্রীলঙ্কা ভালোভাবে নেয়নি। ২০১৪ সালে অবশ্য ভারত ভোট দানে বিরত থাকলেও তা শ্রীলঙ্কার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি।

বর্তমানে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা উভয় দেশেই নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এ বছর জানুয়ারি মাসে শ্রীলঙ্কায় সরকার পরিবর্তনের পর অল্প সময়ের মধ্যেই স্বল্প ব্যবধানে উভয় দেশের মধ্যে চারটি উচ্চ পর্যায়ের সফর সংঘটিত হয়—শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রীর ভারত সফর, ভারতের বিদেশমন্ত্রীর শ্রীলঙ্কা সফর, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির ভারত সফর এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর শ্রীলঙ্কা সফর। এর থেকেই প্রমাণ হয় সম্পর্কের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে উভয় দেশের নেতাদেরই আগ্রহ রয়েছে। সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী পুরোপুরি কার্যকর করে তামিলদের ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়াও আরও যেসব ইস্যু রয়েছে সেগুলি হল : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা, ভারতের সুরক্ষা, দু'দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধি, উপকূল অঞ্চলের নিরাপত্তা, মহাসাগরীয় অর্থনীতি প্রভৃতি। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, আবার নতুন করে সম্পর্ক গড়তে এবং তা নতুন পর্যায় নিয়ে যেতে উভয় দেশেরই রাজনৈতিক সদিচ্ছা রয়েছে। আমরা আশা করতে পারি শ্রীলঙ্কার নতুন নেতৃত্ব বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোবে এবং ভারত ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখবে।

নেপাল

নানা কারণে বিগত বছরগুলিতে নেপালের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নেপালের জাতীয়তাবাদীগোষ্ঠী ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির পরিবর্তন দাবি করে আসছে, যদিও ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিশেষ সূত্রটি এই চুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই চুক্তির ধারা অনুযায়ী নেপালি নাগরিকরা ভারতে অফুরন্ত সুবিধা ভোগ করে আসছে এবং এই সুবিধা ভারতীয় নাগরিকদের প্রাপ্ত সুবিধার সমতুল। এই চুক্তি নেপালকে ভূমিবেষ্টিত দেশের অসুবিধাগুলি অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। নেপালের কায়েমি স্বার্থ ভারত-নেপাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নেপাল নিট আমদানিকারী হিসেবেই থেকে গিয়েছে, যদিও তাদের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ যথেষ্টই মজুত রয়েছে। অন্যদিকে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির নেপালের বন্যার প্রভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছে। একই সময় অবশ্য নেপালে অভিযোগ উঠছে ভারতের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাদের দেশে প্রকল্প নির্মাণে ভারতের তরফে অযথা বিলম্ব ঘটছে। তাছাড়া এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নেপাল রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এই দেশ দেখেছে রাজতন্ত্রের অবসান, মাওবাদী বিদ্রোহীদের উত্থান ও অবনমন, রাজনীতির মূলস্রোতে মাওবাদীদের প্রত্যাবর্তন, গণতন্ত্রের উত্থান প্রভৃতি। এখন অবশ্য সে দেশে চলেছে নতুন সংবিধান রচনার কাজ।

একাধিক কারণে গত বছর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নেপাল সফর ঐতিহাসিক ছিল। গত ১৭ বছরে এটাই কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর। ক্ষমতাসীন হবার তিন মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর এই সফর। এই সফরের পূর্বে দু'দেশের বিদেশমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত-নেপাল যৌথ কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বিগত ২৩ বছরের মধ্যে এ ধরনের বৈঠকও এই প্রথম। প্রধানমন্ত্রী মোদীই হলেন একমাত্র বিদেশি যিনি নেপালের গণপরিষদে এবং আইনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন।

নেপালিদের সংবেদনশীল মনোভাবের প্রেক্ষিতে '১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি নতুন করে পর্যালোচনা করতে এবং সময়োপযোগী করে তুলতে সম্মতি দেওয়া হয়' যাতে 'সংশোধিত চুক্তি বর্তমান সময়ের বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এর লক্ষ্য বহুমুখী ও গভীর সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করা।' (৪ আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর নেপাল সফরের সময় সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া যৌথ বিবৃতি)। বিশ্বাসের ঘাটতির যে বাতাবরণ নেপালে সৃষ্টি হয়েছে তার ওপর প্রলেপ দিতে প্রধানমন্ত্রী নেপালবাসীদের আশ্বস্ত করে বলেন, নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও ইচ্ছাই ভারতের নেই এবং দ্বিপাক্ষিকভাবে বা আঞ্চলিক ফোরামে ভারত নেপালকে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। বিভিন্ন প্রকল্পের সময়-সীমাও নির্দিষ্ট করা হয়, যেমন পঞ্চেশ্বর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, আপার কার্নালি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রকল্প উন্নয়ন চুক্তি এবং সহযোগিতার জন্য আরও নতুন নতুন ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়। সার্বিকভাবে ভারত-নেপাল সম্পর্কের ভিত্তিকে আরও মজবুত করে তুলতে একটা ধাক্কা দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে কেউই সহজে অনুধাবন করতে পারবে যে ভারত প্রকৃতপক্ষেই সম্পর্কটাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী এবং নেপালবাসীদেরও এখন এই বিশ্বাসটা আরও বেশি করে জন্মেছে যে ভারতের প্রতিশ্রুতি পালন করার ক্ষমতা রয়েছে।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় দক্ষিণ এশিয়ায় বিগত এক বছর যাবৎ যে উদ্যমী কূটনীতিকে সঙ্গী করা হয়েছিল বিভিন্নভাবে তা ফলপ্রসূ হয়েছে; বিশ্বাসের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তা অনেকটাই কমিয়ে আনা গিয়েছে; প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতার প্রতি আস্থা বেড়েছে; সম্পর্কগুলিকে আরও দৃঢ় করেছে; কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছে; বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে দীর্ঘমেয়াদের জন্য 'অ্যাজেন্ডা' নির্ধারণ করা হয়েছে; শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা এলাকার উন্নয়ন, বিকাশ ও একাত্মকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে ভূমি, উপকূল ও আকাশপথের মধ্যে সংযোগ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক একাত্মকরণ। কৌশলে সূক্ষ্মভাবে এই বার্তাই পাঠানো হয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে সদস্যগণ একসঙ্গে কাজ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সেখানে দ্বিপাক্ষিক বা উপ-আঞ্চলিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, যাতে ইচ্ছুক সদস্যরা পারস্পরিকভাবে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। বর্তমানে প্রয়োজন নজরদারিতে তৎপরতা বৃদ্ধি ও এ পর্যন্ত যে সব সুফল পাওয়া গেল সেগুলিকে সুসংহত করে এগিয়ে যাওয়া, যে সব প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে সেগুলি পূরণ করা এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করা।❑

[লেখক আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত; এবং রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী উপ-প্রতিনিধি ছিলেন।)
emial : achal_malhotra@hotmail.com]

ভারত-মার্কিন সম্পর্ক

একটি দেশ বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো গণতন্ত্র। অপরটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সহজ বুদ্ধিতে এই দু'দেশের তো হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার কথা। কিছু জটিল কূটনীতির মারপ্যাঁচে ভারত ও আমেরিকা বহুক্ষেত্রে একে অন্যের থেকে ছিল মুখ ঘুরিয়ে। বৈরী নয়, তবে গলায় গলায় ভাব ছিল বলাটাও অনৃতভাষণ। দিন বদলেছে। কূটনীতির টানাপোড়েনে দু'দেশ এখন কাছাকাছি। তারা কি পারবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে? জিজ্ঞাসার পাশাপাশি উত্তর খোঁজারও চেষ্টা আছে **কে সি সিং**-*এর এই নিবন্ধে।*

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭-এ। সেই ইস্তক পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দুটি দেশই গণতান্ত্রিক। একই মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক মঞ্চে কিন্তু অনেক সময় এদের মধ্যে বেঁধেছে খটাখটি। অবশেষে ১৯৮৯-এ সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ও তথাকথিত 'ঠান্ডা যুদ্ধ' অবসানের পর ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে আঁতাতের আগল যায় খুলে।

শুরুয়াত নরসিংহ রাও-এর জমানায়। এরপর ভারত-মার্কিন সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টায় শামিল হয়েছেন সব প্রধানমন্ত্রী। বাজপেয়ি সরকারের গোড়ার দিকে ১৯৯৮-এর মে মাসে ভারতের পরমাণু পরীক্ষার পর অবশ্য এই সম্পর্ক বেশ কিছুটা ঘা খায়। ভারতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসে ওয়াশিংটন। জট কাটে যশোবন্ত সিং-স্ট্রোব ট্যালবট আলোচনায়। বিশ্বে ভারতের ভূমিকা ও মর্যাদার যথার্থ স্বীকৃতির পথ যায় খুলে। আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য দু'দেশ হয় একমত।

আমেরিকার বোধোদয় হয় যে, আন্তর্জাতিক পরমাণু ও অন্যান্য প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ভারতকে আর অচ্ছুত করে রাখা যাবে না। ভারত এক উদীয়মান শক্তি। আর্থিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একে ঠাঁই দেওয়া দরকার। ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন হোয়াইট হাউসের চোখে জোটনিরপেক্ষ ভারত বন্ধুভাবাপন্ন দেশ হলেও নির্ভরযোগ্য অংশীদার ছিল না। দু'দেশের সম্পর্ক অবশ্য একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে ১৯৭১-৭২-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও ওয়াশিংটন-বেজিং গা ঘেঁষাঘেঁষির কালে। মার্কিন নেতারা তখন ভারতকে ভাবতেন সোভিয়েত রাশিয়ার এক অঘোষিত তাঁবেদার। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি ও ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ মজবুত হওয়ার দরুন ভারতকে অংশীদার হিসেবে কাছে টানাতে ওয়াশিংটনের চেষ্টা কারও নজর এড়ায়নি।

ক্লিন্টন জমানায় স্ট্র্যাটেজিক সহযোগিতায় অর্থনৈতিক দিকটি আমেরিকার কাছে হয়ে ওঠে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বিশাল বাজার স্বভাবতই গুরুত্ব পায়। ১৯৯৫-এ মার্কিন বাণিজ্যসচিব রন ব্রাউনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারতে আসে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানোর দিকটি খতিয়ে দেখতে। ১৯৯৯ থেকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি যায় পালটে। বিল ক্লিন্টন ভারত সফর করেন ২০০০-এ। পরের বছরই প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি যান আমেরিকা। ৯/১১-এর হামলার পর জঙ্গিরা বিশ্বের সামনে এক মূর্তিমান বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিনরা বুঝতে পারে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতকে দরকার। চীন ক্রমশ ক্ষমতাধর হয়ে উঠতে থাকায় এশিয়ায় নিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রাখতে এক শক্তিশালী ভারতের প্রয়োজন বুঝতে দেরি হয়নি জর্জ বুশের। এই দুই নতুন পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেই মার্কিন নীতি চালিত হচ্ছে।

তখন থেকে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা চলছে ঘন-ঘন। বেশ কিছু জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ বা যৌথ কর্মীগোষ্ঠীও গড়া হয়েছে। এসব কথা মাথায় রেখে আমেরিকার সঙ্গে মোদী সরকারের আলাপ-আলোচনার পালার দিকটি ভেবে দেখা দরকার। নজির হিসেবে, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির কথা বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র ভারতের ক্রমবর্ধিত শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে দু'দেশের সহযোগিতা এ চুক্তির লক্ষ্য নয়। ১৯৭৪-এ ভারতের 'শান্তিপূর্ণ' পরমাণু পরীক্ষা ইস্তক আমেরিকা ও তার দোসরদের জারি করা উচ্চ প্রযুক্তি হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞাও যায় উঠে। আমেরিকা বুঝতে পারে যে ভারতকে চীনের নাগাল পেতে হলে ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কার এসব নিষেধাজ্ঞা হঠানো দরকার।

আর্থিক, ব্যাংকিং এবং ইউরো সংকটে আমেরিকা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় ভারত-মার্কিন সম্পর্কে দেখা যায় কিছুটা ভাটার টান। নিজের কিছু সমস্যা থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে মুশকিলে পড়তে হয় ভারতকেও।

অনেক অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যকাল শুরুর সময় ভারত-মার্কিন সম্পর্কে একটা থমকে থাকা ভাব ছিল। দু'দেশেই বৃহত্তর দিকটি থেকে যায় উপেক্ষিত। ভারত ও আমেরিকার বিভিন্ন মন্ত্রক তাদের নিজস্ব এজেন্ডা নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। খাদ্যভাণ্ডারের বিষয়ে তার উদ্বেগের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ভারতের আপত্তিতে দোহা

বাণিজ্য বৈঠকে অচলাবস্থা দেখা দেয়। আবার ভারতে পরমাণু ক্ষতিপূরণ চুক্তির কড়াকড়ি আমেরিকার কাছে ছিল একেবারেই না-পসন্দ। ভারতে মেধাস্বত্ব অধিকার ঠিকঠাক মেনে না চলার অভিযোগ সরব হতে শুরু করে মার্কিন কংগ্রেসও। পক্ষান্তরে, ভারত মনে করছিল আমেরিকার ভিসা ব্যবস্থায় ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ফের জোরালো করে তুলতে দু'দেশের নেতাদের হস্তক্ষেপ হয়ে পড়ে জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২০১৪-র সেপ্টেম্বরে আমেরিকা সফর, ২০১৫-র জানুয়ারি ওবামার দ্বিতীয়বার ভারতে এসে সাধারণতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে (কোনও মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই প্রথম) প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান এই লক্ষ্যে এক সঠিক পদক্ষেপ।

পরে নয়, খাদ্যশস্য ভাঁড়ার ইস্যুটি সমাধানের জন্য আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে, ভারতের এই যুক্তিতে আমেরিকা রাজি হয়ে যাওয়ায় বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মতৈক্যের পথ খুলে যায়। আবার ওবামার সফরের পর পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত শর্তাদি নিয়ে মার্কিন সংস্থাগুলির আপত্তি খতিয়ে দেখে কড়াকড়ি বেশ কিছুটা শিথিল করে দিল্লি। মোদীর আমেরিকা সফর ও ওবামার ভারতে এসে বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতি থেকে বোঝা পারস্পরিক আস্থা বেড়েছে। সেই সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রও।

ওবামার সঙ্গে মোদীর ব্যক্তিগত সখ্যের দরুন ভারত-মার্কিন সম্পর্ক গত এক বছরে জোরদার হয়েছে। ওয়াশিংটনে সেপ্টেম্বর ২০১৪-র বৈঠকে যাবতীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয় এবং যৌথ বিবৃতিতে তার উল্লেখ থাকে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দশ হাজার কোটি ডলার থেকে পাঁচ গুণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় দু'দেশ। মেধাসম্পদ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য গড়া হয় এক উচ্চ-স্তরের গোষ্ঠী। আমেরিকায় কিছু দিনের জন্য কাজ করতে যাওয়া পেশাদারদের এইচ-ওয়ান ভিসা, নিয়ে ওয়াশিংটন কোনও অঙ্গীকার না করলেও এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের অবদান স্বীকৃতি পেয়েছে। কলকারখানায় উৎপাদনে উদ্ভাবনা ও দক্ষতা বিকাশে নতুন অংশীদারিত্বের জন্য আলোচনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পরমাণু বিদ্যুৎ এবং পরিচ্ছন্ন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে। পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে দু'দেশ অংশীদার হিসেবে কাজ করতে একমত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ২০১৫-র প্যারিস সম্মেলন সফল করতে অঙ্গীকার করেছে উভয় দেশ। এর আগের কিয়োটো চুক্তির পর এই সম্মেলন কার্বন নির্গমনের বিষয়ে নতুন নির্দেশিকা ঠিক করবে। কার্বন কমানোর ব্যবস্থা নিতে ভারতকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমেরিকা।

সামরিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মালাবার নৌ মহড়া আরও জোরদার করতে দু'দেশ ঐকমত্যে পৌঁছেছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করবে উভয় দেশ।

সন্ত্রাসবাদ দমনে দু'দেশ তাদের সংকল্পের কথা ফের জোর দিয়ে জানিয়েছে। জঙ্গিদের নিরাপদ ডেরা ও নেটওয়ার্ক গুঁড়িয়ে দেবার জন্য হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানের ভূখণ্ড থেকে তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া সব জঙ্গিগোষ্ঠীর নাম করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে লস্কর-ই-তৈবা, ডি-কোম্পানি ইত্যাদি। মুম্বই জঙ্গি হামলায় দায়ী কুচক্রীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে পাকিস্তানকে। এটা পাকিস্তানের উদ্দেশে এক সময়োচিত বার্তা।

উচ্চ প্রযুক্তি, মহাকাশ ও স্বাস্থ্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতকে একুশ শতক স্তরের মানে পৌঁছে দেবার দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তেল-গ্যাসের মতো জ্বালানির দাম পড়ে যাওয়ায় অবশ্য কলকারখানায় উৎপাদনের কাজ ফের ফিরতে শুরু করেছে আমেরিকায়। তাহলেও, কিছু ক্ষেত্রে মোদী সরকারের 'ভারতে বানাও' (মেক ইন ইন্ডিয়া) কর্মসূচিতে সাড়া দিতে পারে মার্কিন সংস্থাগুলি। প্রধানমন্ত্রী মোদী চান ফি বছর এক হাজার মার্কিন শিক্ষাবিদ ভারতে আসুন ছাত্র পড়াতে। বিশ্ব তো দূর অস্ত, এশিয়াতেও শীর্ষস্থানীয়দের তালিকায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম ঢুঁড়ে বার করা দুষ্কর। আমেরিকার অধ্যাপক-পণ্ডিতরা এলে আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নত হবে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও দু'দেশ সহযোগিতা বাড়াতে প্রস্তুত। রোগ প্রতিষেধক টিকা তৈরির জন্য দু'দেশ একযোগে কাজ করবে। ভারতে সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার নিতান্তই অভাব। বেসরকারি ক্ষেত্রে কিছু বিশ্বমানের হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। সেগুলিতে কড়া নাড়ার সুযোগ আছে কেবলমাত্র উচ্চবিত্তদের। গরিবের ঠাঁই নেই সেখানে। এর দরুন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নিদারুণ বৈষম্য—একদিকে উজ্জ্বল ইন্ডিয়া, মুদ্রার অপর পিঠে ম্যাড়মেড়ে ভারত।

স্ট্র্যাটেজিক স্তরে, যৌথ বিবৃতিতে মোদীর অ্যাক্ট ইস্ট এবং ওবামার এশিয়ায় রি-ব্যালান্স এর মধ্যে জোড় মেলানোর চেষ্টা আছে। মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড-এর পালটা হিসেবে ভারত-আমেরিকারও একটা ভাবনা-চিন্তা আছে। চীনের কথা মাথায় রেখে, সমুদ্রপথে বিশেষ করে দক্ষিণ চীনসাগরে অবাধ জাহাজ চলাচল সুনিশ্চিত করতে বিবৃতিতে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় আঞ্চলিক শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে।

২০১৫-য় ওবামার দিল্লি সফরকালে তিনটি যৌথ নথি প্রকাশ করা হয়। এদের একটি হল 'ডিক্লারেশন অব ফ্রেন্ডশিপ'। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, আঞ্চলিক ও বিশ্ব শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুস্থিতির কথা বলা হয়েছে এতে। এহেন সব উত্তুঙ্গ লক্ষ্য ভারতের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে গুরুদায়িত্ব। কেননা, ভারত আগে এ ভূমিকা নিতে খুব একটা উৎসাহী ছিল না। এরপর ঘোষণাপত্রে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের মতো মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছে। দু'দেশই এসব মূল্যবোধে বিশ্বাসী। জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধান এবং স্থায়ী উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধতারও প্রতিশ্রুতি আছে। স্বচ্ছ এবং নিয়মবিধিভিত্তিক বাজার সুনিশ্চিত করতেও দু'দেশ দায়বদ্ধ। নিছক স্ট্র্যাটেজির গণ্ডিতে আটকা না থেকে দ্বিপক্ষ আলোচনা

হবে স্ট্র্যাটেজি ও বাণিজ্য দুটি বিষয়েই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে হটলাইন বসবে। হটলাইন থাকবে দু'দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মধ্যেও।

দ্বিতীয় নথিটিতে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য যৌথ স্ট্র্যাটেজিক ভিশন-এর এক খসড়া আছে। এই অঞ্চলে নিয়মকানুনভিত্তিক এক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য গণতান্ত্রিক দুই দেশ ভারত ও আমেরিকার হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চীনের প্রভাব জাহির করার প্রসঙ্গে অবশ্য নথি কোনও রা কাড়েনি। সিঙ্গাপুরে সাংগ্রি-লা বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে পাঠানোর বিষয়টি ভারত এড়িয়ে গেলেও আমেরিকার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা ফুটে উঠেছে স্পষ্টতই। ছ' দশকের পুরনো নির্জোটের ধ্যানধারণা ছেড়ে ভারত বেরিয়ে আসছে, যাকে কেউ কেউ বলছে দিল্লি এখন জোট বাঁধছে বহু দেশের সঙ্গে।

২০১৫-র জানুয়ারিতে ওবামা সফরের পর জুনের গোড়ায় ভারতে আসেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব অ্যাশটন কার্টার। দশ বছর মেয়াদের নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি কাঠামোয় 'ভারতে বানাও' কর্মসূচিতে মার্কিন প্রযুক্তি কাজে লাগানোর উল্লেখ আছে। বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজের নকশা ও জেট ইঞ্জিন-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চলছে আলোচনা। বিমানবাহী পোতের ডেক বা পাটাতন থেকে বিমান ওড়ার অত্যাধুনিক ক্যাটাপুল্ট প্রযুক্তি পেতে ভারত আগ্রহী। এই প্রযুক্তি আছে একমাত্র আমেরিকার।

দক্ষিণ চীনসাগরের বিতর্কিত অঞ্চলে অধিকার কায়েম ও কৃত্রিম দ্বীপ তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বেজিং। এর ফলে চীনের সঙ্গে পড়শি দেশগুলির মধ্যে উত্তেজনার আঁচ জ্বলছে ধিকিধিকি। এহেন পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়া আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করার দিকে ভারতের নজর দেওয়া জরুরি। ব্রিক্স গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ভারত আবার চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের পথ খোলা রেখেছে। সাংহাই কো-অপারেশন অরগানাইজেশনেও ভারতের ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল। বিভিন্ন দেশ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে চলাটাই দিল্লির কাছে এক চ্যালেঞ্জ। সেই জোট নিরপেক্ষতার যুগ ইস্তক সাউথ ব্লকের কূটনীতিবিদরা বৃহৎ শক্তিগুলি থেকে তফাতে থাকতে মানসিকভাবে অভ্যস্ত। এই মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে বিশ্ব রাজনীতির খেলায় কলকাঠি ভারতের হাতে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ এখন আমাদের কূটনীতিবিদদের কাছে।

এই খেলায় ওস্তাদ ছিলেন জার্মানির বিসমার্ক। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন ১৮৭৩ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানি ছিল পাঁচ বৃহৎ শক্তি। জার্মানির স্বার্থ বুঝে বিসমার্ক অন্য চার রাষ্ট্রের সঙ্গে তার দেশের সম্পর্ক ঠিক করতেন। এখন ভারতের ক্ষেত্রে খাটে এই বিসমার্ক নীতি। মনে রাখতে হবে, সব দেশ আগে দেখে নিজের স্বার্থ। আমেরিকা তার বাজারে ঢোকার সুযোগ দিয়ে চীনের উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছে। সেইসঙ্গে ছিল সে দেশে উপুড়হস্ত মার্কিন লগ্নি ও প্রযুক্তি। আর সেসময় আমেরিকা ও তার স্যাঙাতদের চাপানো প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞায় ভুগতে হয়েছে ভারতকে। এখন সেসব উঠে যাওয়ায় প্রতিযোগিতার জগতে ভারতের সামনেও উন্নতির পথ উন্মুক্ত। ভারতকে রুখতে পারবে না কেউই। ভারত নিজে পা পিছলোলে অবশ্য ভিন কথা।❑

[লেখক প্রাক্তন বিদেশসচিব। ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বর্তমানে 'ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক ইনিশিয়েটিভ' নামক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক-এর বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সদস্য।
email : ambkcsingh@gmail.com]

হাল ছেড়ো না বন্ধু...

প্রতিযোগিতার পূর্ব শর্তই হল হার-জিত। আজ যে বাজি জিতল, খোঁজ নিলে দেখা যাবে আগেরবার সে হয়তো ব্যর্থ হয়েছিল। ডব্লুবিসিএস-এর কোন একটা পর্যায়ে একবার ব্যর্থ হওয়ার অর্থ আরও এক বছরের হতাশা-বিষাদ। ঘরে লাঞ্ছনা, বাইরে গঞ্জনা। সবকিছু যেন বিবর্ণ-ধূসর। মনের ভিতর পুঞ্জীভূত বেদনা নিজের অজান্তেই চোয়ালকে শক্ত করে তোলে, মনে হয় আজই প্রমাণ করে দিই— আমি ফুরিয়ে যাইনি, আমিও পারি। কিন্তু ডব্লুবিসিএস এক মহারণ, চাই শুধু ধৈর্য আর ধৈর্য।

মনে রাখতে হবে 'সাফল্য আর ব্যর্থতা'—এই দুই নিয়েই জীবন। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের পথে ব্যর্থতা আসতেই পারে, তা বলে ভেঙে পড়লে চলবে না, ব্যর্থতাকে স্পোর্টিংলি নিতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে ব্যর্থতার কারণগুলি। কথায় আছে Failures are divided into two classes – those who thought and never did, and those who did and never thought অর্থাৎ শুধুমাত্র চিন্তা বা প্রচেষ্টা সাফল্য এনে দিতে পারে না, সাফল্যের জন্য দরকার সঠিক চিন্তা-ভাবনা সহযোগে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ব্যর্থতা যদিও বা আসে, তবে তা থেকে নিতে হবে প্রকৃত শিক্ষা। জ্ঞানী-গুণিরা তাই বলেন, There are no mistakes or failures, only lessons, কারণ Failures are the seeds of one's most glorious successes. আরও একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, সাফল্য তখনই আসবে যদি না তুমি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে যাও। তাই তো বলা হয়, Use the losses and failures as a reason for action, not inaction. হাল ছাড়লে চলবে না, লেগে থাকতে হবে। লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই আসবে, আজ না হয় কাল।

ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সবার আগে জানতে হবে পিএসসি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ঠিক কি চাইছে, কেনই বা চাইছে। বিডিও, সিটিও কিংবা ডিএসপি-র চাকরিতে মাধ্যমিক মানের ইতিহাস, ভূগোল বা বিজ্ঞানের ওপর এত কেন গুরুত্ব। কোন যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল কিংবা কোন নদীর উৎস কোথায়— এ সব জানলে কি ভাল ও দক্ষ অফিসার হওয়া যায়? উত্তর যদি হয় 'না', তাহলে পিএসসি কেন ঐ সমস্ত বিষয় বা টপিক সিলেবাসে রেখেছে? খুঁজে বার করতে হবে এই সব প্রশ্নের উত্তর। এই সমস্ত উত্তরের মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে 'সাফল্যের চাবিকাঠি'। কোনও বিষয় বা টপিক পড়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে 'কি পড়ছি', 'কেনই বা পড়ছি', 'সত্যিই কি এটা পড়ার প্রয়োজন আছে'। স্কুল-কলেজে আমরা অনেক বিদ্যা অর্জন করেছি। এখন সময় এসেছে সেই বিদ্যার্জিত জ্ঞানের যথোপযুক্ত ও সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটিয়ে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা, আকাশের চাঁদকে হাতের তালুবন্দি করা। ডব্লুবিসিএস-এর প্রস্তুতিকে সুসংহত ও ছন্দোবদ্ধ করার জন্য অতি অবশ্যই একজন দক্ষ ও পারদর্শী গাইডের প্রয়োজন—যিনি দিশেহারা পরীক্ষার্থীদের সর্বদা পাশে থেকে নিরন্তর যুগিয়ে যাবেন লড়াইয়ের অক্সিজেন। একাগ্রচিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাদের পরিশ্রম আর আমাদের সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত গাইডেন্স—এ দু'য়ের সঠিক মেলবন্ধনে আসবে তোমাদের বহুকাঙ্খিত জয়। এ জয় একান্তই তোমাদের জয়, তোমাদের প্রচেষ্টার জয়।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ইতিহাস সৃষ্টি করল

WBCS-2013 Gr.-A & B

Md. Nazir Hossain
Rank-1 in Executive

Soma Bhowmick
Rank-1 in CTO

Rohed Shaikh
Rank-4 in Executive

Sayen Ahmed
Rank-5 in DSP

Joydeep Chakraborty
Rank-5 in CTO

Mahwish Paikar
1st Attempt CTO

একটি মাত্র সেন্টার থেকে WBCS-2013 Gr.-A তে 26 জন এবং Gr.-B তে 09 জন অর্থাৎ মোট 35 জন চূড়ান্ত সফল।

পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের 'Inclusive Postal Course'। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাশ টেস্ট এবং মকটেস্ট। নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু ক্লাশ করার সুযোগও। কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।

Academic Association
The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
9830770440
9674478644

Website : www.academicassociation.in • Centre : Uluberia-9051392240 • Birati-9674447451 • Darjeeling-9832041123

আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে ভারতের অর্থনৈতিক কূটনীতি

সাম্প্রতিককালের বহু আলোচিত একটি শব্দবন্ধ অর্থনৈতিক কূটনীতি। সমসাময়িক পরিস্থিতির নিরিখে এর পরিবর্তিত অর্থ, উন্নয়ন ও বিকাশে এর প্রভাব এবং বাণিজ্য-বিনিয়োগ ও আঞ্চলিক সহযোগিতায় এর গুরুত্ব বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরেছেন অধ্যাপক **ড. রাম উপেন্দ্র দাস।** *'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে এর ভূমিকাও আলোচিত হয়েছে এই পরিসরে।*

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনৈতিক সংযোগ এক নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যতে এর গতি আরও ঊর্ধ্বমুখী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জটিল ও বহুমুখী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও বাজার-নির্ভর প্রতিক্রিয়ায় এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকায় বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে কূটনীতি এবং অর্থনৈতিক কূটনীতির তাৎপর্যও নতুন অর্থ বহন করে আনে।

অর্থনৈতিক কূটনীতির নতুন পরিপ্রেক্ষিত

কূটনীতির একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের এমন প্রয়োগ, যা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যকার আনুষ্ঠানিক সম্পর্ককে মসৃণ করে (সাটো, ১৯৬১)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কূটনীতির পরিসরে আরও নতুন দিক যুক্ত হয়েছে। প্রথমত, দুটি দেশের আলোচনা ও আদানপ্রদান এখন আর শুধু সরকারি স্তরে সীমাবদ্ধ নেই। যোগাযোগ প্রযুক্তি ও যাতায়াতের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তা এখন নাগরিকদের মধ্যে সংযোগ ঘটাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এতদিন দেশগুলির সংযোগসাধন ও মতবিনিময়ের প্রাথমিক ক্ষেত্র ছিল রাজনৈতিক, সামরিক ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের এই যুগে এখন এগুলির জায়গা নিয়ে অর্থনৈতিক বোঝাপড়ার ফলে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কারণেও অর্থনৈতিক কূটনীতি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশনগুলির সম্বন্ধে মোহভঙ্গ, রাষ্ট্রসংঘের আওতায় কার্যকর অর্থনৈতিক বোঝাপড়া না হওয়া, বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনে আলোচনার সেভাবে অগ্রগতি না হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক স্তরে অর্থনৈতিক সংযোগসাধনের বৃদ্ধি ঘটেছে নজিরবিহীন দ্রুতহারে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় পণ্যের পাশাপাশি পরিষেবা ও বিনিয়োগকেও অন্তর্ভুক্ত করায় এগুলি প্রকৃতিগতভাবে আরও সার্বিক হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক কূটনীতি আজ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়।

আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা : শান্তি স্থাপনকারী প্রগতির লক্ষ্যে

অর্থনৈতিক কূটনীতিকে আরও কার্যকর করে তুলতে হলে অন্য দেশগুলির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। দ্বিপাক্ষিক স্তরে অথবা কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে ব্যবহার করা যায়। অন্য দেশগুলির সঙ্গে আগে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং তারপর অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথে এগোনোর বদলে অর্থনৈতিক প্রগতিকেই শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যবহার করলে তা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে।

ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু্যে (১৭৪৮) বলেছিলেন, শান্তি হল 'বাণিজ্যের স্বাভাবিক পরিণতি'। ইতালীয় অর্থনীতিবিদ পারেটোও (১৮৮৯) দেশগুলির মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য অবাধ বাণিজ্যের কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা যে শান্তি প্রতিষ্ঠার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, তা বহু আগে থেকেই অনুভূত হয়েছিল।

আঞ্চলিক বাণিজ্যের সংযুক্তিকরণ যে শান্তি আনতে পারে, ব্রাউন (২০০৫) সাম্প্রতিককালে তা বলেছেন। এর পিছনে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়েছে, তা হল—

(i) অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণের পর কোনও দেশ অশান্তি বাধালে সংশ্লিষ্ট দেশকে সেজন্য চড়া মাশুল দিতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার বাণিজ্য।

(ii) আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে চোরাই কাঠের মতো বেআইনি সম্পদের ব্যবসা বন্ধ করা যায়। ১৯৯৮ সালে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির অর্থনৈতিক সংগঠন ECOWAS অস্ত্রের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছিল। সদস্য রাষ্ট্রগুলির সম্মতি ছাড়া ওই অঞ্চলে কোনও অস্ত্র আমদানি করা যেত না।

(iii) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে অসামরিক উপায়ে দেশগুলির বিরোধ মিটিয়ে বোঝাপড়া ও আলোচনা শুরু করা সম্ভব।

লি এবং পিউন (২০০৯) বলছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'উদার শান্তি' দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা শান্তির পথ প্রশস্ত করে, কমিয়ে আনে সামরিক শক্তির

ব্যবহার। একটি দেশ চট করে তার বাণিজ্য সহযোগীর বিরুদ্ধে অশান্তিতে জড়াতে চাইবে না, কারণ সেক্ষেত্রে বাণিজ্য ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে। স্কিফ ও উইন্টার (১৯৯৮) বলেছেন, প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য তাদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলে। মার্টিন (২০১০) একটি সহজ তাত্ত্বিক কাঠামোর সাহায্যে দেখিয়েছেন, আঞ্চলিক বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়। রাজনৈতিক নেতারা এর থেকে দু ধরনের লাভ দেখেন।

(i) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি কোনও বিতর্কের নিষ্পত্তিতে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে কাজ করে।

(ii) আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি কোনও সম্ভাব্য যুদ্ধের সুযোগ ব্যয় বাড়িয়ে দেয়।

সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বহু বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আসিয়ান এবং সার্ক গঠিত হয়েছিল অর্থনীতি বহির্ভূত ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এর অন্তর্ভুক্ত হয়, বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সদস্য রাষ্ট্রগুলি। একইভাবে MERCOSUR গঠিত হয়েছিল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্য নিয়ে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বালকান এলাকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনকে সামনে রেখে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ২০০০ সালে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। ২০০৪ সালে মিশর ও ইজরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে পাঁচটি বিশেষ অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মার্কিন বাজারে মিশরীয় পণ্যের অবাধ বাণিজ্যের কথা বলা হয়। তবে এই মিশরীয় পণ্যের অন্তত ৩৫ শতাংশ ইজরায়েলের সহযোগিতায় উৎপাদন করতে হবে। হিংসাদীর্ণ আফ্রিকাতেও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিবেশী দেশগুলির পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষ ঘুচিয়ে এই চুক্তি শান্তি স্থাপনে সহায়ক হবে।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা

অর্থনৈতিক কূটনীতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল দেশীয় ও বৈদেশিক ক্ষেত্রের টানাপোড়েন। অর্থনৈতিক কূটনীতি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমারেখা টানা ততই দুরূহ হয়ে পড়ছে। পাঁচের দশক থেকে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা যেভাবে বেড়েছে এবং সাম্প্রতিককালে এই বৃদ্ধির হার যেভাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে, তাতে আগে যা দেশীয় ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে ভাবা হত, তাই এখন আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

এ জন্যই ভারতের দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ, আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন, যাতে অর্থনৈতিক কূটনীতি আরও সুচারুভাবে তার কাজ করতে পারে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র বাহ্যিক মাত্রা

প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রয়াস, ভারতীয় অর্থনীতির দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করেছে। এই কর্মসূচিতে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এটি কেবল দেশীয় অর্থনীতির ঘেরাটোপে সীমায়িত বলে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা ঠিক করেন না, এর আন্তর্জাতিক মাত্রা রয়েছে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রকে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। খুব সংরক্ষণশীল হিসাবেও পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ এখন ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন—GDP-র অর্ধেকেরও বেশি। তুলনামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা, বিদেশি মূলধন, প্রযুক্তি, দক্ষতা, পরিচালনগত কুশলতা, আঞ্চলিক মূল্যশৃঙ্খল প্রভৃতি নানা কারণে বাহ্যিক ক্ষেত্রের এই প্রাধান্য। তাই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রয়াসের সঙ্গে অন্তর্লীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মাত্রা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝা দরকার। অর্থনৈতিক কূটনীতিকে সঠিক পথে চালিত করতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বিকাশের চালিকাশক্তি হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্র। মাত্রাজনিত ব্যয়সংকোচের সুবিধা ভোগ করে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে চাহিদা এবং জোগান—দুই দিকের বিকাশেই এটি সাহায্য করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মধ্যে উৎপাদনের বিশেষীকরণ, উদ্ভাবন, কর্মসংস্থানের মতো বিকাশমুখী উপাদানসমূহ আছে। তবে সব দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর সুবিধা সমানভাবে পাওয়া যায় না। বাজারের আকার ছোট হওয়ায় মাত্রাজনিত ব্যয়সংকোচের সুবিধা না পাওয়ার মতো চাহিদার দিকের প্রতিবন্ধকতা যেমন থাকে তেমনি প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতায় উৎপাদনশীলতা হ্রাসের মতো জোগানের দিকের প্রতিবন্ধকতাও দেখা যায়। এর মোকাবিলায় বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণ এক কার্যকর পন্থা। পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রের উদারীকরণ সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে বাজারের আয়তন বাড়ায়, দূর হয় চাহিদা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা। অন্যদিকে আঞ্চলিক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ শুধু অর্থনৈতিক সম্পদই আনে না, প্রযুক্তিগত সম্পদের মাধ্যমে পরিচালনগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করে জোগান সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাও দূর করে। ম্যানুফ্যাকচারিংকে যথার্থই বিকাশের চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে হলে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সংযুক্তিসাধন একান্ত আবশ্যক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য অর্থনৈতিক কূটনীতিকে আঞ্চলিক সংযুক্তিকরণের ওপর জোর দিতেই হবে।

এই বিশ্লেষণকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে, উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে উৎসাহ দিতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা দরকার। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঋণ, বিমা, ব্যাংক গ্যারান্টি, জাহাজ পরিষেবা প্রভৃতি অপরিহার্য, এগুলি বাণিজ্যে সহায়তার পাশাপাশি

রপ্তানিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ায়। অন্যদিকে পরিষেবা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পণ্যের ওপর নির্ভরতা থাকে। যেমন— স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিষেবা নির্ভর করে চিকিৎসা সংক্রান্ত উপকরণ ও ওষুধপত্রের ওপর। আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিতে পণ্য ও পরিষেবার এই পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকার করতে হবে। বাস্তবে কিন্তু উলটোটাই ঘটে। পণ্য বাণিজ্য ও পরিষেবা বাণিজ্য চলে স্বতন্ত্র ধারায়। এই দুই ধারাকে মেলানো দরকার। কেননা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হলে লেনদেন ব্যয় কমবে, তাতে পণ্যসামগ্রী আরও সস্তা হবে।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগের যোগসূত্রকে আরও মজবুত করা গেলে আঞ্চলিক বাণিজ্য উন্নততর স্তরে পৌঁছবে। এর ফলে রপ্তানিক্ষেত্রে আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সদস্য রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতাও বাড়বে। আঞ্চলিক স্তরে কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি একদিকে যেমন, আঞ্চলিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে বিনিয়োগের প্রবাহকে শক্তিশালী করবে, তেমনি বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগ, আঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের বিকাশে।

এক্ষেত্রে আন্তর্দেশীয় বিনিয়োগ প্রবাহের সাহায্যে যদি উল্লম্ব সংযুক্তিকরণ ও অনুভূমিক বিশেষায়নের ওপর জোর দেওয়া যায়, তাহলে বাণিজ্য-বিনিয়োগ গাঁটছড়া আরও মজবুত হবে এবং আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উল্লম্ব সংযুক্তিকরণ বলতে বোঝায়, একটি নির্দিষ্ট শিল্পের উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সংযুক্তিকরণ। অনুভূমিক বিশেষায়নের অর্থ উৎপাদনের একই পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্যের পৃথকীকরণ।

এগুলির মাধ্যমে আঞ্চলিক মূল্যশৃঙ্খল গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক সুসমন্বিত উৎপাদন প্রক্রিয়া বিকাশের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে কর্মসংস্থানের ওপর।

উৎস সংক্রান্ত নিয়মাবলির প্রাথমিক কাজ হল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থেকে বিপথে যাওয়া আটকানো। কোনও পণ্যের উৎস অনুসন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতি অনেক সময়ে উৎপাদনের উপাদানে বড়সড় পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে। এই নিয়মগুলি অনেক ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের কাজও করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে এই মূল্য সংযোজন একটি সংস্থাকে শ্রমিকদের মজুরি, মূলধন লগ্নিকারীকে সুদ, জমি মালিককে ভাড়া এবং উদ্যোক্তাকে মুনাফা দেবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতিতে যত বেশি মূল্য সংযোজিত হবে, ততই একটি সংস্থার উৎপাদনের উপাদানগুলির মূল্য চোকাবার ক্ষমতা বাড়বে।

ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রকে অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখলে এবং এর আন্তর্জাতিক মাত্রাকে মান্যতা দিতে পারলে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযান এক অসামান্য উদ্যোগে পরিণত হতে পারে। আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনকে ভিত্তি হিসাবে নিয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতি হয়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ এবং সার্বিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চাবিকাঠি।❑

[লেখক নতুন দিল্লির 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ'-এর অধ্যাপক।
email : upendra@ris.org.in]

জোট সরকার জমানায় সুপ্রশাসনের অনন্য নজির

বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারি, শ্লথ অর্থনৈতিক বিকাশ, নীতি পঙ্গুত্বের এক দশক পর নতুন সরকার প্রশাসনের হাল ধরেই দেশবাসীর মনে এক নতুন আশা সঞ্চার করেছে। দৃঢ় নেতৃত্বের ওপর ভর করে অর্থনীতির হাল ফেরানোর পাশাপাশি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আনা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা তথা দরিদ্র মানুষের কল্যাণসাধনে অভিনব সব সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সূচনা ঘটিয়েছে নতুন সরকার—গড়ে তুলেছে সুপ্রশাসনের অনন্য নজির। লিখেছেন **ড. এ সূর্য প্রকাশ।**

ভারতীয় রাজনীতিতে জোট সরকারের জমানা শুরু ১৯৮৯ সালে। তখন থেকেই সাধারণভাবে একটা ধারণা জন্ম নেয় যে দেশ বুঝি এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট নৌকোর মতো অকূল পাথারে পড়ল। সর্বস্তরে এমনকী প্রশাসনিক স্তরে আর্থিক বা সামাজিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই দিশাহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠত। রাজনৈতিক এই অনিশ্চয়তার ফলে দক্ষতার অভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। শাসনকার্যের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্নও উঠত। এই অনিশ্চয়তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলে বৈদেশিক ক্ষেত্রে যতটা বিরূপ প্রভাব পড়েছে ততটা বোধহয় আর কোনও ক্ষেত্রে পড়েনি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের একটা এলোমেলো প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবেশী দেশগুলির উদ্ধত প্ররোচনার জবাবে ছকে বাঁধা শান্ত প্রতিক্রিয়া দেশের আত্মমর্যাদাতেই আঘাত হানছিল। আন্তর্জাতিক মহল বিশ্বাস করেছিল যে এই দেশের নেতা হওয়ার যোগ্যতা নেই, কারণ এই দেশ আদতে নেতৃত্বহীন।

আচমকাই পট পরিবর্তন ঘটে ২০১৪ সালের মে মাসে। বিপুল জনাদেশ পেয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) সংসদের নিম্নকক্ষে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। গত ১২ মাসে যাঁরা নতুন প্রধানমন্ত্রীকে কাজ করতে দেখেছেন তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত হবেন যে তিনি শুধুই পুরোভাগে থেকে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না, বরং আরও হাজার হাজার দেশবাসীকে আধুনিক ভারত গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করছেন। তর্কের খাতিরে অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ফারাকটা এখন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের পর জনসাধারণের মনে যে বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছিল এনডিএ সরকার তা বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু আগেকার সেই হতাশাজনক পরিস্থিতিটা যে কেটে গেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং বর্তমান সরকারও এক এক করে দ্রুততার সঙ্গে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে চলেছে যার ফলাফল অতি স্পষ্ট।

মূলত এই পথে হেঁটেই অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাফল্য এসেছে সরকারের। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার তুলনামূলক বিচার করতে গেলে তা সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে এনডিএ সরকারের বিভিন্ন অংশের কাজকর্মের নিরিখেই করতে হবে। সমস্যাসংকুল গত এক বছরে সরকারকে এমন সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে যা সমাধানের উদ্যোগ আগে নেওয়া হয়নি। লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, স্যানিটেশন ও স্বচ্ছতা বিধান, ব্যাংকের সুবিধার আওতার বাইরে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সেই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি বহু পুরোনো সমস্যার মোকাবিলায় একগুচ্ছ জাতীয় কর্মসূচির সূচনা করেছে সরকার। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল, মহাসড়ক নির্মাণের মতো পরিকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকার জোর দিয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচির ওপর। সেই সঙ্গে, বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সংকট ও বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের চিত্রটা ভালো করে খতিয়ে দেখলে সরকারের কাজ করার রীতি ও ধরনের পরিবর্তনটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। গত এক বছরে দরিদ্র মানুষ, কৃষক, বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে তথা কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করতে যে একগুচ্ছ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা।

বিদেশ নীতিতে অভাবনীয় সাফল্য

নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত সমস্ত দেশের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিদেশ নীতিতে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা ঘটান।

তার পর থেকে বিভিন্ন সরকারি সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওঁলাদে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পারের মতো বিশ্বনেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর আলাপ-আলোচনা ও বৈঠক ভারতের বিদেশ নীতির মস্ত বড় সাফল্য। অন্যদিকে প্রতিবেশী

দেশগুলির সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফরের গন্তব্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন ভুটানকে। এরপর আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে এ দেশের যোগাযোগ আরও দৃঢ় করতে দুবার নেপাল সফরে গিয়েছেন। মাত্র এক বছরে তিনি ১৯টি দেশ সফর করেছেন। সফর চলাকালীন বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তোলার পাশাপাশি নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার, বা ফ্রান্স, জার্মানি এবং কানাডার জনসভায় নিজের ভাষণে আমজনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী। এই সমস্ত দেশে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে এত স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এর আগে দেখা যায়নি।

সুপ্রশাসনের অনন্য নজির

বিপর্যয় মোকাবিলা তথা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছে বর্তমান সরকার। ইরাক থেকে নার্সদের উদ্ধারের মাধ্যমে এই অভিযান শুরু। তারপর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে থাকা কয়েক হাজার মানুষকে উদ্ধার করতে ভারতীয় বিদেশ কার্যালয়ের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনা ও নৌসেনাবাহিনী। শুধু দেশের মানুষ নয়, বহু বিদেশি নাগরিককেও বিপদ থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রশাসন পরিচালনার নতুন রীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী এই সামগ্রিক উদ্ধারকার্য সরেজমিনে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং-এর ওপর। সমস্ত ভারতীয়র উদ্ধারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেনারেল সিং জিবুতি-তে থেকে এই পুরো উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। সংঘর্ষকবলিত এলাকা থেকে বিপন্ন মানুষদের উদ্ধারের এই সুসমন্বিত অভিযানকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সাধুবাদ জানিয়েছে। কারণ এই অভিযানে যে ৫৬০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৯৬০ জন অন্যান্য ৪১টি দেশের নাগরিক।

নেপালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরও সরকার যেভাবে সাহায্যের অঙ্গীকার নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে সে দেশের পাশে দাঁড়িয়েছে তা দেশবাসী বা বিশ্ববাসী আগে দেখেনি। এই বিপর্যয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে 'জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী' (ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স, এনডিআরএফ) নেপালে পৌঁছে চব্বিশ ঘণ্টার ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য শুরু করে দেয়।

দেশের মধ্যেও যে কোনও বিপর্যয়ে তা সে জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যাই হোক বা বিহারের ভূমিকম্প—এক সুপরিকল্পিত বিপর্যয় মোকাবিলা কৌশল সবসময় গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের যে সমস্ত কৃষকের ফসল অসময়ের বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলেছেন।

জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আরও একটি অভিনব উদ্যোগ হল রেডিও 'টক শো', 'মন কি বাত'। অল ইন্ডিয়া রেডিও-র এই মাসিক অনুষ্ঠান এখন শ্রোতাদের কাছে এতটাই জনপ্রিয় যে বেশকিছু টেলিভিশন সংবাদ চ্যানেলও অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করছে।

নতুন সরকারের সুপ্রশাসনে আরও একটি নতুন নজির গড়েছেন বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী বা বিদেশে যাত্রাকারী ভারতীয় নাগরিককে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় দূতাবাস ও বিদেশমন্ত্রকের তরফে অসহযোগিতার অভিযোগ করে আসছিলেন। এবার তাদের সেই অভিযোগের নিরসন হয়েছে। এখন দেশের বিদেশমন্ত্রী নিজে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ভারতীয়দের কাছ থেকে টুইটে আসা সমস্যার কথা শুনে (কখনও রাত দুটোতেও) নিকটবর্তী দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সাহায্য না পৌঁছোনো পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার ওপর নজর রাখেন। কোনও সমস্যাসংকুল এলাকায় আটকা পড়ে যাওয়া ভারতীয় শ্রমিকদের কোনও গোষ্ঠীর কাছ থেকে এই ধরনের সাহায্যের আবেদন আসতে পারে। আবার বিদেশে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার কোনও মহিলা বা পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলা কোনও ব্যক্তি—নির্দ্বিধায় বিদেশমন্ত্রীর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে টুইট করতে পারেন। একটি টুইটেই দেশ তার পাশে দাঁড়াবে। যথাশীঘ্র সম্ভব তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করে আনা হবে। এই দেশ এহেন বিদেশমন্ত্রক বা বিদেশমন্ত্রী আগে কখনও দেখেনি। শ্রীমতী স্বরাজের এই পদক্ষেপ অন্যান্য গণতন্ত্রের বিদেশমন্ত্রীদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে।

অর্থনীতিতে নতুন দিশা

নতুন সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন দেশের অর্থনীতির হাল নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ ছিল। বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারি ও প্রশাসনের বেহাল দশা দেখে বিদেশি লগ্নিকারীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) বিকাশহার ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে কি না তার ওপরই কিন্তু একটি সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। তাই ভারত যে লগ্নির পক্ষে আদর্শ স্থান তা বোঝানোটা বিশ্বের শিল্প ও বাণিজ্যমহলকে অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দেয়।

ফলে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে অনেক ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনা করে তাঁর প্রথম বাজেটটি পেশ করতে হয়। শিল্প ও বাণিজ্যমহলে এই বাজেট যথেষ্ট সমাদৃত হয়। কারণ এই বাজেটে দেশে লগ্নি টানার উপযোগী স্পষ্ট বার্তা ছিল। তার ফলে দেশে অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। এছাড়া লগ্নিকারীদের যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয় সেগুলো দূর করতেও সরকার এবার সক্রিয় হয়। সেইসঙ্গে বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক পরিবেশ গড়ে তোলার পথে বাধাগুলি সরাতেও উদ্যোগী হয় সরকার। অর্থমন্ত্রী আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজকোষ ঘাটতি জিডিপি-র ৩ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন।

এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ অনেক অনুকূল হয়েছে এবং বর্তমানের হিসাব অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জিডিপি-র বার্ষিক বিকাশহার চীনকে ছাপিয়ে ৯ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলবে। এছাড়া, দেশের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডারে বর্তমানে ৩৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলার রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে পূর্বতন সরকার

যেভাবে একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত হয়েছে তার পরিবর্তে যে এক দুর্নীতিমুক্ত সরকার ক্ষমতায় এসেছে এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা। পূর্বতন সরকারকে বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারির অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার স্পেকট্রাম ও কয়লা ব্লক বণ্টনের এক স্বচ্ছ পদ্ধতি গ্রহণ করে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফলে কোনওরকম কেলেঙ্কারি ছাড়াই মসৃণভাবে নিলাম পর্ব সমাধা হয়েছে। সরকারের ঘরে প্রভূত রাজস্ব এসেছে।

যোজনা কমিশনের বিলোপ ঘটিয়ে সরকার আরও একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন চিন্তাভাবনার দৈন্যে ভুগতে থাকা এই সংস্থা দেশের বিকাশে নতুন কোনও দিশা দেখাতে পারছিল না। এই সংস্থা আসলে সেই সমাজতান্ত্রিক জমানার এক প্রতীক যা আজকের জমানাতেও মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। এর মাধ্যমে দেশকে তার মতাদর্শে মূল শিকড়ের কথা মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল না। তাই প্রধানমন্ত্রী যখন যোজনা কমিশনের বিলোপ ঘটিয়ে তার পরিবর্তে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া' (এনআইটিআই নীতি) আয়োগ গঠনের কথা ঘোষণা করেন তখন সব মহলই এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায়। নীতি আয়োগ আধুনিক ভারতের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় নীতি রচনার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবে। সেইসঙ্গে রাজ্যগুলিকে শামিল করে আর্থিক নীতি নির্ধারণ করবে। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম নয়, এই পরিবর্তনের তাৎপর্য অনেক গভীর। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. অরবিন্দ পানাগরিয়াকে এই কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সনরূপে মনোনীত করেছে সরকার। এছাড়াও কমিশনের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্য এই কমিশনকে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন।

এর পাশাপাশি, প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হয়েছে সরকার।

কেন্দ্রীয় কর থেকে রাজ্যগুলিকে প্রদেয় অংশ ৩২ শতাংশ থেকে ৪২ শতাংশ করার এক যুগান্তকারী সুপারিশ করেছে চতুর্দশ অর্থ কমিশন। প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে অর্থ কমিশনের এই সুপারিশগুলি গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন। এর ফলে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে রাজ্যগুলি অতিরিক্ত ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা পাবে। শ্রী জেটলি জানিয়েছেন যে রাজ্যগুলিকে প্রদেয় করের পরিমাণ ৪২ শতাংশ করার এই সিদ্ধান্ত আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতারই পরিচয় দিয়েছে সরকার।

পরিকাঠামোক্ষেত্রে নতুন জোয়ার

আগামী বছরগুলিতে যে হারে এদেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী পরিকাঠামোর উন্নতি না হলে সব কিছুই অর্থহীন হয়ে যাবে। দেশের বেহাল পরিকাঠামো বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে অনেকদিন ধরেই বড় চিন্তার বিষয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে শিল্প ও বাণিজ্য মহলের শীর্ষকর্তাদের আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন যে পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর তাঁর সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই কারণেই তাঁর কার্যালয়ের তরফে বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে এবং কয়লা, শক্তি, মহাসড়ক, রেল ও বন্দর-সহ বিভিন্ন মন্ত্রকের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়ার ফলে দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ১০ শতাংশ থেকে ৩.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ২৪ ঘণ্টার বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর—যার সূচনা হবে জাতীয় রাজধানী দিল্লি, রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশকে দিয়ে। শক্তিমন্ত্রী বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্বাদশ পরিকল্পনায় বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রাও অতিক্রম করে যেতে চান।

একই রকমভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে জাতীয় সড়ক নির্মাণের ওপর। সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার (ইউপিএ) দশ বছরের শাসনকালে এই ক্ষেত্রটি ভীষণভাবেই অবহেলিত রয়ে গিয়েছিল। সমস্ত মন্ত্রক ও মন্ত্রীদের কাছে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোনও মন্ত্রীর কাছেই ঢিমেতালে চলার অবকাশ নেই।

প্রকৃত পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচারাভিযান

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিবর্তনের লক্ষ্যে একাধিক প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে যেমন, স্বচ্ছ ভারত, স্বচ্ছতা বিধান প্রচারাভিযান এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি। মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীতে 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানের সূচনা হয়। দেশের ৭০ শতাংশ বাড়িতে শৌচাগার না থাকার ফলে মহিলাদের সম্ভ্রম ও নিরাপত্তার ওপর তার কীভাবে আঁচ পড়ছে সেই অপ্রীতিকর বিষয়ও জনসমক্ষে আলোচনা করার সাহস দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের বাড়িতে বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণের অভিযান এখন এক ব্যাপক মাত্রা নিয়েছে এবং শৌচাগার নির্মাণের জন্য দরিদ্র পরিবারগুলিকে সরকার ভরতুকি দিচ্ছে। বর্তমানে ৬ কোটি শৌচাগার নির্মাণের লক্ষ্য রয়েছে সরকারের সামনে।

সরকারের অন্য যে কর্মসূচিটি অভাবনীয় সাফল্যের মুখ দেখেছে সেটি হল—'প্রধানমন্ত্রী ধন জন যোজনা'। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা ও বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা ও তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। দেশের যে দরিদ্র জনসাধারণ এতদিন ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে বহু যোজন দূরে ছিলেন তাঁরাও এবার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ পেলেন। এই কর্মসূচি চালু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের দরিদ্র জনসাধারণ বিভিন্ন ব্যাংকে মোট ১৫ কোটি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। দেশের এই সমস্ত মানুষ তাদের নতুন ব্যাংক

অ্যাকাউন্টে মোট ১৫,৮০০ কোটি টাকারও বেশি জমা দিয়েছেন। যাদের নামে অ্যাকাউন্ট তারা প্রত্যেকে একটি 'RuPay' ডেবিট কার্ড পাবেন যার মধ্যেই ১ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার সুবিধা থাকবে। সেই সঙ্গে ছয় মাস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঠিকমতো চালনা করা হলে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফটের সুবিধাও পাওয়া যাবে।

ধন জন যোজনার অভাবনীয় সাফল্যের পর সামাজিক নিরাপত্তার বিধানের এক অনন্য নজির গড়ে মূলত দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণসাধনে আরও তিনটি কর্মসূচি চালু করেছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা যেখানে যেকোনও ব্যক্তি বছরে ১২ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার সুবিধা পেতে পারবেন। এছাড়াও রয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা'—এই জীবন বিমা প্রকল্পে বছরে মাত্র ৩৩০ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে। আরও রয়েছে 'অটল পেনশন যোজনা'—প্রধান নাগরিকদের জন্য গৃহীত স্বল্প প্রিমিয়ামের পেনশন প্রকল্পে কোনও ব্যক্তি নিজেদের কর্মজীবনে যে পরিমাণ অর্থ জমা দেবেন তার ভিত্তিতে ১০০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন পাবেন।

দেশের যুব সম্প্রদায়কে কর্ম নিযুক্তির উপযোগী করে তোলা তথা তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারের দুটি অভিনব ভাবনা হল—'স্কিল ইন্ডিয়া' এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'।

ক্ষমতায় এসেই প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বার্তা দিয়েছেন—'সহজ সরল সরকার, সর্বোচ্চ প্রশাসন'—এর অর্থ বিভিন্ন সরকারি প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও আমলাতন্ত্রের দায়বদ্ধতা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পরিবর্তন

কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রেলমন্ত্রী হিসাবে সুরেশ প্রভু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে মনোহর পারিক্করকে অন্তর্ভুক্ত করে এক নতুন পথে চলার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পেশ করা প্রথম রেল বাজেট একগুচ্ছ জনমোহিনী ঘোষণা করে সাংসদদের হাততালি কুড়োনোর বদলে রেলের আর্থিক হাল ফেরানোরই চেষ্টা করেছেন রেলমন্ত্রী। তাঁর এই দীর্ঘমেয়াদি দূরদৃষ্টি বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

পরিশেষে

ক্ষমতায় এসে সরকারের রাশ ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সমর্থক ও সমালোচক—উভয় পক্ষকেই সমানভাবে বিস্মিত করেছেন। তাঁর পূর্বতন সরকারের নেওয়া সব পদক্ষেপকেই তিনি নস্যাৎ করে দেননি দেখে তাঁর সমালোচকরা অবাক হয়েছেন। তিনি প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটা সুস্থিতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেয়েছেন। তাঁর নতুন অবস্থানের ফলে প্রশাসন পরিচালনা, জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল মিলতে শুরু করেছে।

কিন্তু সমালোচকদের কাছে তা যথেষ্ট নয়। তাঁদের মতে প্রথম বছরের শেষে সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাঁরা একথা ভুলে যাচ্ছেন যে এটা কোনও টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ নয়। প্রধানমন্ত্রী লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জনাদেশ পেয়ে পাঁচ দিনে টেস্ট ম্যাচ দলের অধিনায়ক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন। সরকারের প্রথম বছরের কাজকর্মকে টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা হিসাবেই দেখতে হবে। টেস্ট ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ যেভাবে চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে হয় ঠিক সেভাবেই শ্রী মোদীর সামনে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য পাঁচ বছর সময় রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা দেশ এতদিন পরে এমন একজন নেতাকে পেয়েছে যিনি দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে আশার সঞ্চার করতে পারেন, সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে দেশ নির্মাণের মঞ্চে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন। লাভের ঘর যখন প্রায় পূর্ণ তখন সামান্য লোকসানে ক্ষতি কী!! ❑

[লেখক প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যান।
email : chairman@prasarbharati.gov.in]

WBCS-2014 Gr. A/B

কত হতে পারে মেনসের কাট অফ??

সম্পূর্ণ নতুন ফর্মাটে পরীক্ষা হল ২০১৪ মেনসের। ভাষাপত্র এবং অপশনাল ছাড়া বাকিগুলি MCQ। MCQ-এর সুবিধা হল ১০০ তে ১০০ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এখানে থাকছে নেগেটিভের খাঁড়া। যাই হোক, সব দিক বিবেচনা করে অনুমান করা যায় 'এ'/'বি' গ্রুপে ডাক পাওয়ার প্রত্যাশীদের বাংলা-ইংরাজিতে ২১০, ইতিহাস-ভূগোল এবং সংবিধান-অর্থনীতিতে ২২০, অঙ্ক-জিআইতে ১২০, বিজ্ঞান প্রযুক্তি-জিকে-ইভিএস পত্রে -১১০ ন্যূনতম স্কোর থাকা দরকার। কম্পালসরিরর এই নম্বরের সাথে অপশনালে কমপক্ষে ১৮০ থাকা দরকার। অর্থাৎ এই হিসেব অনুযায়ী কম করে মোট ৮৬০ নম্বর থাকলে 'এ'/'বি' গ্রুপে ডাক পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী থাকা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই হিসাব একেবারেই অনুমানভিত্তিক এবং বেশ কিছু প্যারামিটারের উপর নির্ভরশীল। এই অনুমান মিলতেও পারে, আবার নাও পারে। এটা থেকে কাট অফ সম্পর্কে একটা আবছা আভাস পাওয়া যেতে পারে মাত্র।

কাট অফ যাই হোক না কেন, রেজাল্ট কবে প্রকাশিত হবে—সেই জন্য হা পিত্যেশ করে বসে না থেকে আজ থেকেই এখন থেকেই ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি শুরু করা দরকার। ইন্টারভিউ গ্রুমিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে Numero uno তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 'উড বি' এবং রিটায়ার্ড WBCS এবং IAS/IPS অফিসারদের সামনে মক ইন্টারভিউ দিন, আর তাঁদের সুপরামর্শে নিজের পারফরমেন্সকে শাণিত করে তুলুন।

FREE workshop on WBCS INTERVIEW

ডব্লুবিসিএস ইন্টারভিউয়ের ওপর একটি ফ্রি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে কলেজ স্কোয়ারে **আগামী ২৬শে জুলাই (রবিবার) বেলা ১২টায়।** ডব্লুবিসিএস ২০১৪-তে 'এ', 'বি', 'সি' কিংবা 'ডি' গ্রুপে ডাক পাবার ব্যাপারে আশাবাদীরা এই ওয়ার্কশপে যোগদান করতে পারেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। যোগদান করার জন্য ঠিকানা-সহ নিজের নাম নিম্নলিখিতভাবে SMS করুন 9674478644 নম্বরে:
P.T workshop_(Name)_(Address)

ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে জেনে যেতে হবে-

• বিগত ২-৩ বছরের ইন্টারভিউয়ে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছিল • আপনি কিভাবে ইংরাজিতে কথা বলার দুর্বলতাকে ঢাকবেন • আপনি কিভাবে নিজের স্ট্রেংথকে প্রকাশ করবেন বা কিভাবে দুর্বলতার জায়গাগুলিকে লুকোবেন • ইন্টারভিউয়ে আপনার সঠিক অ্যাপ্রোচ এবং অ্যাটিটিউড কেমন হবে। • কোন ধরনের পোশাক আপনি পরবেন • স্ট্রেস ইন্টারভিউ আপনি কিভাবে সামলাবেন • রাজনৈতিক বিতর্কিত বিষয়গুলিকে কিভাবে সামলাবেন • আপনার পছন্দের পদগুলিকে কিভাবে সাজাবেন • আপনার প্রথম পছন্দের পদটি থেকে প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবেন • কিভাবে তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন • ইন্টারভিউয়ের সময় বডি মুভমেন্ট এবং পস্চার কেমন হবে • দীর্ঘ ট্রেন বা বাস যাত্রার পরেও কিভাবে নিজেকে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখবেন • কিভাবে বোর্ড সদস্যদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন • চা বা কফি অফার করলে আপনি কি করবেন • কিভাবে এবং কতটা ধৈর্য সহকারে প্রশ্নগুলি শুনবেন • আপনার উত্তরের অ্যাপ্রোচ এবং ভয়েস মডুলেশন কেমন হবে • ইন্টারভিউয়ের আগে এবং চলাকালীন কিভাবে টেনশন নিয়ন্ত্রণ করবেন • আপনার বায়োডাটা থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে বা তার উত্তরই বা কি হবে • গ্র্যাজুয়েশন বা মাস্টার ডিগ্রির পর অলস বছরগুলির হিসাব কিভাবে মেলাবেন।

আপনার ইন্টারভিউ প্রস্তুতির বৃত্তটা সম্পূর্ণ হোক অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সুচারু সহায়তায়।

WBCS-2014: Gr. A/B/C/D INTERVIEW

The Final Step to Enter Your Dream World

Think Before You Leap...

সুসমৃদ্ধ জ্ঞান আর প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব—এই হলো ডব্লুবিসিএস অফিসারদের যোগ্যতার মাপকাঠি। অভিনন্দন, আপনারা প্রথম ধাপে সফল হয়েছেন। এইবার যেটুকু বাকী রইল সেটা কিন্তু বই পড়ে পাওয়া যায় না,—সেটা হলো চলায়, বলায়, ওঠায়, কথায় কীভাবে বিনয় ও আত্মবিশ্বাসের আভা ছড়ানো যায়,—সেই রহস্যকে আয়ত্ত করা,—ইংরাজীতে যাকে বলে **'grooming'**। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর এই ক্ষেত্রে সাফল্যের হার বিস্ময়কর! বিশেষজ্ঞরা সমগ্র প্রশিক্ষণে হাতে কলমে গড়ে তোলেন প্রার্থীদের। মক ইন্টারভিউ আর প্রেজেন্টেশনে নিখুঁত হয়ে ওঠে তারা। সাক্ষাৎকারের দিন সমাসন্ন,—প্রয়োজন এখন প্রতিটি অমূল্য মুহূর্তের সদ্ব্যবহার। যোগ্য, সফল, ডব্লুবিসিএস দিয়েছে উজ্জ্বল এক ঝাঁক নক্ষত্রতুল্য ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে শাণিত করুন নিজেকে। হয়ে উঠুন তাদেরই একজন।

মেনস ক্লাব

যারা কোন কারণে ক্লাশরুম গাইডেন্স বা পোস্টাল কোর্স করতে পারছেন না, তাদের জন্য রয়েছে মেনস ক্লাব। যারা একবারও মেনস দিয়েছেন, তারা মাত্র ৪০০ টাকার বিনিময়ে নিতে পারেন মেনস ক্লাবের সদস্যপদ। সদস্যরা পাবেন নির্বাচিত কিছু ক্লাশ করার ও মকটেস্টে বসার সুযোগ। পাবেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ইভিএসের সম্পূর্ণ নোটস। একদম বিনামূল্যে। তাছাড়া কিছু মক ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগও পাবেন। বিশদ জানতে শনি রবিবার ১ থেকে ৩টের মধ্যে চলে আসুন কলেজ স্ট্রীটে।

Academic Association

✆ 9830770440
✆ 9674478644

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website: www.academicassociation.in ▪ Centre: Uluberia-9051392240 ▪ Birati-9674447451 ▪ Darjeeling-9832041123

‘পুবে কাজ কর’—এখন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া

ভারতের বিদেশ নীতি গত এক বছরে আগের তুলনায় অনেক গতিশীল। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং একের পর এক বিদেশ সফরে গেছেন—পুরানো সমস্যার সমাধান এবং আগামীতে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন। বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করবার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারটিকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পূর্বের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও বর্তমান সরকার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী। কারণটা অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিকও বটে। কেন ‘লুক ইস্ট’ হল ‘অ্যাক্ট ইস্ট’—বিশদে জানাচ্ছেন **ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।**

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। নতুন এনডিএ সরকার সম্প্রতি দ্বিতীয় বর্ষে পা দিল। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সরকারপ্রধান নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন দেশ সফর ও সেই সব দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা সেদিকেই ইঙ্গিত করে। এই সময়কালে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের ১৯টি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বিভিন্ন পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নানা চুক্তি ও সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিভিন্ন নতুন নতুন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি মিলেছে। বিশেষ করে নতুন সরকারের যে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্প, তাতে নানা গুরুত্বপূর্ণ সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক আর্থিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বিশিষ্ট প্রস্তাব এর অন্তর্ভুক্ত। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বিদেশ নীতি নির্ধারণের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়ই হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বিশেষ করে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আবহ। ‘সেল্‌ফ-ইন্টারেস্ট স্ট্র্যাটিজিস্‌’ বা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল। আজ সেই সময়ের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাতাবরণ ও নানা টানাপোড়েন সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও সঠিক নীতি নির্ধারণ। সেই অর্থে বিদেশ নীতি দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অভ্যন্তরীণ নীতির পরিপূরক ও সুদৃঢ় সম্প্রসারণ।

বিদেশ নীতির একটা আভাস পাওয়া গেল নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেই। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার শপথগ্রহণ করল রাষ্ট্রপতিভবনের প্রাঙ্গণে সেই অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ নেতারা হাজির ছিলেন। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দেওয়া হবে তার আঁচ সুস্পষ্ট। এই বিশ্বায়নের যুগে জাতীয় আর্থিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা ছাড়াও জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখতে সুনির্দিষ্ট বিদেশ নীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতি, বিভিন্ন অগ্রাধিকার ও কর্মসূচির গুরুত্ব যে এই বিদেশ নীতিতে প্রতিফলিত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নানা আঞ্চলিক ও বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় বা ইস্যু, বিরোধ, সংঘর্ষ ও উত্তেজনাপ্রবণ ঘটনাও এর উপর ছায়া ফেলে। সামরিক শক্তি, আর্থিক ক্ষমতা, দেশের উত্থান-পতন, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য পুনর্বিন্যাস, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন—এসবই বিদেশ নীতি প্রণেতাদের মাথায় রাখতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী যখন দুই ভাগ বা মেরুতে বিভক্ত—একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যদিকে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন—তখনকার সেই পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। পুরানো সোভিয়েত রাশিয়া আর নেই। চীন ও জাপানের বিকাশ ও ভারতের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এক নতুন বিশ্বের জন্ম দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম বর্ষে বিভিন্ন দেশের সফরের নির্যাস থেকে স্পষ্ট যে, এই নীতির উদ্দেশ্য নানাবিধ। ছোটবড় সব দেশ আজকের যুগের দুনিয়ায় একে অপরের কাছ থেকে নানা আর্থিক ও ভূ-রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা পাবার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য—তা যে উৎপাদনমুখী শিল্প হোক বা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রই হোক। বর্তমান বিশ্বে অনেক জায়গায় আঞ্চলিক বিষয় ও স্বার্থকে কেন্দ্র করে বহু দেশীয় মঞ্চ বা মাল্টি-ল্যাটারাল ফোরাম-এর উদ্ভব হয়েছে। যেমন ভারতের স্বার্থ জড়িয়ে আছে এমন সব মঞ্চ—জি-টোয়েন্টি (G-20), ব্রিকস্‌ (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা), আইবিএসএ (ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা), পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলন (ইস্ট এশিয়া সামিট) প্রভৃতি। এগুলো সম্বন্ধে ভারতকে ভাবতে হচ্ছে, কারণ এদের সঙ্গে কৌশলগত, আর্থিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত স্বার্থ ও ভূ-রাজনৈতিক

বাধ্যবাধকতা জড়িয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমণ থেকে এটা প্রতীয়মান যে, সরকার এই বিষয়গুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর মধ্যে তিনটে দিক লক্ষণীয়। একদিকে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির প্রতীক হিসাবে গুরুত্ব, অন্যদিকে রয়েছে বিশ্বশান্তির পক্ষে কৌশলগত বিষয়, নানা দ্বি-পাক্ষিক ইস্যু, যার মধ্যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ আর ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফর ছিল ভুটানে। পরে নেপাল যান গত বছর আগস্ট মাসে। এ বছর মার্চে শ্রীলঙ্কা, মরিশাস ও সেসেলশ সফরের মধ্যে রয়েছে 'প্রতিবেশীরা প্রথম' (নেবারহুড ফার্স্ট) এই নীতির অগ্রাধিকার ও সম্প্রীতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা। প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণসূচি থেকে পশ্চিমি দেশ—জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পরে অস্ট্রেলিয়া, ফিজিও বাদ যায়নি। চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া—এসবের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিদেশ নীতির বিশেষ অগ্রাধিকার। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর-সংলগ্ন দেশগুলির প্রতি আগ্রহ ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও এক নতুন দিশার দ্যোতক।

বিদেশ সফর ছাড়াও পররাষ্ট্রনীতিতে আর একটি নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। সেটি হল রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে বোঝাপড়ার আবহ এবং ব্যক্তিগত সমীকরণ ও রসায়ন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার ভারত সফর ও চীনের রাষ্ট্রপতি শি চিনফিং-এর ভারতে প্রথম পর্যায়ে গুজরাটে আসা ও চীনে নরেন্দ্র মোদীর সফরের প্রথমভাগে শান জি-তে অভ্যর্থনার মধ্যে এটি প্রকট রয়েছে। কূটনীতির পরিভাষায় আস্থাবর্ধক আবহ তৈরি হয়েছে। বিদেশসচিব এস জয়শঙ্করের বক্তব্য অনুযায়ী, দুদেশের মধ্যে কীভাবে আস্থা বাড়ানো যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতভেদ দূর করে ঐকমত্য তৈরি করা যায়—সে সমস্ত বিষয় শীর্ষনেতৃত্বের মধ্যে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। ভারত-চীন বাণিজ্য বৈষম্য দূর করা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিভিন্ন পন্থা নিয়েও কথাবার্তা হয়েছে। দুদেশের মধ্যে জটিল ও সংবেদনশীল সম্পর্ক। বিশেষ করে সীমান্ত সংক্রান্ত মতপার্থক্যকে মাথায় রেখে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রক্রিয়া চালু রাখার ক্ষেত্রে মোদী-শি চিনফিং আলোচনা যে এক সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ, তা এককথায় বলা যায়। বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া 'টেরাকোটা ওয়ারিয়ার্স মিউজিয়াম' ও ডা. শিং শ্যান বৌদ্ধ মন্দিরে যাওয়ার মধ্যে এক আনুষ্ঠানিক, আন্তরিক, সহজ সৌজন্য ও সাংস্কৃতিক কূটনীতির এক অনন্য শৈলীর আভাস পাওয়া যায়। বেজিং-এ চব্বিশটি চুক্তি ছাড়াও যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে চীনা সংস্থাদের যোগাযোগ বাড়ানো, ওষুধ ও কৃষিপণ্যের দ্বিমুখী বাণিজ্য বৃদ্ধি, কিছু ভারতীয় পণ্যের চীনের বাজারে প্রবেশ করার জন্য পণ্যমাশুল হ্রাসের মতো পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। সীমান্ত বিরোধের বিষয়ে পারস্পরিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ও সমান অধিকারের কথা ভেবে এর সমাধান যে প্রয়োজন তা মোদী ও চীনের প্রধানমন্ত্রী লি খ্যছিয়াং-এর মধ্যে আলোচনায় স্বীকৃত হয়েছে। দুদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক বাড়ানো, সামরিক হটলাইন চালু করা ও সীমান্তে সেনা কম্যান্ডারদের মধ্যে যোগাযোগ ও সময়ে সময়ে বৈঠক করা প্রভৃতি বিষয়ে দুদেশ সম্মত হয়েছে। পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণ বিরোধী প্রচেষ্টায় শামিল হওয়ার ব্যাপারে দু'পক্ষের ভিতর আলোচনা সফল হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প অনুযায়ী চীন ভারতে বিনিয়োগ উৎসাহ দেখিয়েছে একথা স্পষ্ট হয়েছে। ভারতে দু হাজার কোটি (২,০০০) মার্কিন ডলার বিনিয়োগের আশ্বাসও পাওয়া গেছে। এই যে কূটনৈতিক 'এনগেজমেন্ট' বজায় রেখে, রূঢ় বাস্তব সমস্যাগুলি সম্পর্কে সজাগ থেকে যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর চীন সফর, তা বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি ও বিশ্বায়নের দাপটের মধ্যেও খোলামেলা পথে চলার একটি পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক এক জটিল বিষয় ও এক বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে কণ্টকাকীর্ণ সীমান্ত সমস্যা, অন্যদিকে বিশাল জিডিপি ও বিপুল সামরিকসম্ভার-সমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, এমনকী নিকট প্রতিবেশী দেশগুলির অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা ও অসম বাণিজ্য ঘাটতি সর্ববিষয়ে এই টানটান রজ্জুর উপর পদচারণার মতো সতর্ক পদক্ষেপ ও দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

গত এক বছরে বিদেশ নীতিতে ভারত-চীন সম্পর্ক ছাড়াও কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও প্রসারিত ও জোরদার করা, নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও উদার বিশ্ব-অর্থনীতির পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে যতদূর সম্ভব সুযোগসুবিধা আদায় করা ও বাড়ানো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে জাপানের আর্থ-কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করা, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলি—সার্ক-ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বহুমাত্রিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বাতাবরণ নির্মাণ করাও রয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে এনডিএ সরকার 'পুবে তাকাও' (লুক ইস্ট), নীতির যে সব পর্যায় 'পুবে কাজ কর' (অ্যাক্ট ইস্ট) প্রক্রিয়া শুরু করেছে ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে, সে বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে। এই প্রসঙ্গেই চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ, এইসব পুবের দেশগুলি চীনের প্রভাব-বলয়ের মধ্যে রয়েছে বা চীন প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারত ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। এতৎসত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রে ভারতের কিছু স্বাভাবিক সুবিধা আছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কাছে ভারতের আর্থিক উন্নতি গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য যে, ক্ষমতার সমীকরণে তার নিশ্চিত প্রভাব পড়বে। দক্ষিণ কোরিয়ার কথাই ধরা যাক। দক্ষিণ কোরিয়ার অনেক সংস্থারই ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারতে নতুন

পরিকাঠামো নির্মাণ ও বিশেষ বিশেষ শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্পপতিরাও শিল্পসংস্থাগুলি বড় ভূমিকা নিতে পারে। যেমনটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মায়ানমারের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব-এশিয়া শিখর সম্মেলনে বলেছিলেন—'Korea is part of India's daily life with Indian people using Korean phones, cars, computers and games. When Indian cricketers celebrate their victory in Gangnam Style, you know that Korea is now firmly on Indian minds.' অর্থাৎ কোরিয়ার অনেক কিছু জিনিস যেমন ফোন, গাড়ি, কম্পিউটার, খেলার সামগ্রী ভারতীয় জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে।

'পুবে কাজ কর' নীতি তাই ভারত-চীন সম্পর্ককে নিছক দ্বিপাক্ষিক স্তর থেকে বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে উন্নীত করে। ক্ষমতার বণ্টন ও বলয় এবং তার প্রভাবে যে সমীকরণ ও কাঠামো তৈরি হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন স্তর ও পরতে ওঠানামা করে। এখানেই প্রয়োজন পর্যালোচনা ও বোঝাপড়া ও তার আলোকে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কৌশলগত ও কূটনৈতিক দক্ষতা ও মুনশিয়ানার প্রয়োগ। বিশেষ অঞ্চল, যেমন দক্ষিণ চীন সাগর সংলগ্ন অঞ্চলে চীনের যে আধিপত্য ও প্রভাব রয়েছে, তা মনে রেখে সচেতন দৃঢ় ও কৌশলী পদক্ষেপ ছাড়া গতি নেই। ক্রম পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে 'পুবে কাজ কর' নীতির মূল্যায়ন প্রয়োজন।

'পুবে কাজ কর' নীতি মূলত 'পুবে তাকাও' নীতিরই সংশোধিত ও বর্ধিত রূপ। নরসিমহা রাও যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (১৯৯১-১৯৯৬) সেই সময়ই এই নীতির উদ্ভব। এই নীতির পিছনে কয়েকটি সুস্পষ্ট ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রেক্ষাপট ছিল। এক বৃহৎ সামরিক ও আর্থিক শক্তি হিসাবে চীনের উদয় এবং তার প্রভাব বলয়ের এলাকা বৃদ্ধি। সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন এবং ভারতের ক্ষেত্রে এক কৌশলগত ও অর্থনৈতিক দিকে শূন্যতার সৃষ্টি। ভারতের পূর্বোত্তর রাজ্যগুলির আর্থিক স্থিতিশীলতা তৈরির তাগিদ এবং সর্বোপরি পূর্ব-এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের প্রভাব বিস্তারের ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা। এই সমস্ত কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ প্রভৃতি পশ্চিমি দুনিয়ার দেশগুলির থেকে গতানুগতিক আর্থিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক ও বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি পুরোপুরি নিবদ্ধ না রেখে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের তাগিদেই পুবের দিকে আগ্রহ বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে সক্রিয় প্রচেষ্টা ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ মোদী সরকারের অগ্রাধিকারে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এটি ভারতের আর্থিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে এবং বিদেশ নীতিতে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগ নেওয়ার দিকে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিগত কয়েক বছরে ভারতের সঙ্গে এই অঞ্চলের দেশগুলির বাণিজ্যের পরিমাণ পুবের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের ইঙ্গিতবহ। উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বর্তমানে ভারতের সামগ্রিক বাণিজ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ ২০০৩-০৪ সালে ছিল ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তা বেড়ে ২০১৩-১৪-তে ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। এই সময়ে আসিয়ান সদস্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বাণিজ্যিক ছাড়া কৌশলগতও বটে।

প্রধানমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই এই ভৌগোলিক অবস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পুবে সক্রিয়ভাবে কাজ করার উৎসাহ অনুভব করেছেন। বিগত ১৩ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মায়ানমারের রাজধানী নে পি তও-তে পূর্ব-এশিয়ার শিখর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার ব্যক্ত করেছিলেন : 'Since entering office six months ago, my government has moved with a great sense of priority and speed to turn over 'Look East Policy' into 'Act East Policy'. The East Asia Summit is an important pillar of this policy.

No other forum brings together such a large collective weight of global population, youth, economy and military strength, nor is any other forum so critical for peace, stability and prosperity in Asia-Pacific and the world.' অর্থাৎ পূর্ব-এশিয়া শিখর সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর কোনও ফোরাম-এ এত জনসংখ্যা, যুবশক্তি, আর্থিক ও সামরিক শক্তির সমাহার অন্য কোথাও পাওয়া ভার। শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার জন্য এই ফোরামের ভূমিকা অমূল্য। তাই এই দিকে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

উল্লেখযোগ্য যে, আসিয়ান সদস্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে দশটি দেশ—ব্রুনেই, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম। এই শিখর সম্মেলনেই প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ চীনসাগর সম্পর্কে একটি আচরণবিধি (কোড অব কনডাক্ট) প্রস্তুত করার জন্য সমুদ্র-আইন বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশন (ইউএন কনভেনশন অন ল' অব দ্য সি)-এর উদ্দেশে আবেদন করেছেন। এছাড়াও শিখর সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রে সন্ত্রাসবাদ, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা ও অর্থ লেনদেন, সাইবার অপরাধ ও মহাকাশ বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাব ভারত সমর্থন করেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত সরকার দক্ষিণ-এশিয়ার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সচেষ্ট। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর হয়েছে ভুটানে আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়েছেন বাংলাদেশে। এটি যেমন একদিকে 'প্রতিবেশীরা প্রথম', তেমনই 'পুবে কাজ কর' নীতিরও পরিপূরক। আর্থিক, মানবিক ও বিপর্যয় মোকাবিলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত-সহ এইসব দেশের স্বার্থও অভিন্ন। পূর্ব-এশিয়ার শিখর সম্মেলনে তাই প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলির উদ্যমের প্রশংসা করেছেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দেশে দেশে ভিন্নতা, বৈষম্য, জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ, স্বার্থ ও ক্ষমতার ভারসাম্যের সমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রভাব ফেলে। ভারতের 'পুবে কাজ কর' নীতির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। তাই অনাশক্তিধর দেশের বিভিন্ন পদক্ষেপ মাথায় রাখতে হবে। দক্ষিণ চীনসাগরে যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার কথা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ওখানে চীনের সামরিক উপস্থিতি ও ডুবো পাহাড়ের মাথায় কৃত্রিম দ্বীপে বিমানক্ষেত্র নির্মাণ ও কামান-সহ যুদ্ধাস্ত্র সাজানো তাৎপর্যপূর্ণ। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও টনক নড়েছে। সে দেশের প্রতিরক্ষাসচিব হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এলাকাটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তাই পার্শ্ববর্তী দেশগুলিও এই এলাকায় চীনের সামরিক উপস্থিতি মেনে নিতে পারছে না। এছাড়া চীনের জিডিপি-র হার তথা আর্থিক ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ভারতের বিদেশ নীতি প্রণেতাদের ভাবাবে। কারণ এটি একটি নির্ণায়ক শক্তি বলেই গণ্য।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক নিছক দ্বিপাক্ষিক স্তরে আবদ্ধ থাকে না। এই অঞ্চলের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক নিয়মে মার্কিন সংবেদনশীলতা ছায়া ফেলেছে। এমনই রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বহর। তাই তো সম্প্রতি আসিয়ান দেশগুলির এক নিরাপত্তা সম্মেলন উপলক্ষে সিঙ্গাপুরে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব, দক্ষিণ চীনসাগরে চীনের তৎপরতা যে যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না তা স্পষ্ট করেছেন। চীন অবশ্য দাবি করেছে যে, তাদের কার্যকলাপ যুক্তিসংগত ও আইনসম্মত এবং কোনও দেশের ক্ষতির সম্ভাবনা তাতে নেই। তবুও আমেরিকা বলেছে যে, তাদের যুদ্ধবিমান ও রণতরি সক্রিয় থাকবে আগের মতোই।

'পুবে কাজ কর' নীতির যথাযথ রূপায়ণে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত সম্পর্ক জড়িত। তাদের মধ্যে ভিয়েতনাম অন্যতম। ভারত-ভিয়েতনাম সম্পর্কের এই দিকটি স্পষ্ট হয়েছিল রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হ্যানয় সফরের সময়। এই সফর ছিল চীনের রাষ্ট্রপতির ভারত সফরের ঠিক আগে। রাষ্ট্রপতি মুখোপাধ্যায়ের সফর শেষে যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাতে ভিয়েতনামকে 'পুবে কাজ কর' নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নীতির ব্যাপারে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রতি সমর্থন বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ও সম্মেলনে ব্যক্ত করা হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দেই ভারত-ভিয়েতনাম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। ভারতের বর্তমান সরকার তাকে আরও শাণিত করেছে। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের ২০১৪-এর আগস্টে ভিয়েতনাম সফরের সময় তা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ডুং-এর ২০১৪-র অক্টোবরে ভারত সফর তাকে আরও জোরদার করেছে, একথা বলাই বাহুল্য। গত পাঁচ বছরে ভারত-ভিয়েতনাম বাণিজ্য তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বহু শিল্পসংস্থা—তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ সম্পদ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ, চিনি উৎপাদন, আইটি, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ—বিশেষ করে নৌবাহিনীর বিষয়ে ভারত-ভিয়েতনাম সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। দক্ষিণ চীনসাগর, অবাধ যাতায়াতে ভিয়েতনামের অধিকারের প্রতি ভারতের সমর্থন এই কৌশলগত অংশীদারিত্বের নীতিরই ফলশ্রুতি।

এবার ভারত-ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কের বিষয়ে আসা যাক। এই সম্পর্কও 'পুবে কাজ কর' নীতিরই আর একটি মাত্রা। দুদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক প্রাচীন। তার উপর জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের স্থপতি হিসাবে দুদেশের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। ধীরে ধীরে এই ধারাবাহিক সম্পর্ক 'পুবে কাজ কর' নীতিতে বিবর্তিত হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কয়েকগুণ বেড়ে হয়েছে ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত নভেম্বরে পূর্ব-এশিয়ায় শিখর সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বৈঠক এই সম্পর্ক ও মৈত্রীর আবহকে যে শক্তিশালী করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এরপর আসতেই হবে অস্ট্রেলিয়া প্রসঙ্গে। ভারতের 'পুবে কাজ কর' নীতির ক্ষেত্রে এই মহাদেশও বড় ভূমিকা নেবে। ২০০৯-১০ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা, মূলত ভারতীয় ছাত্রদের উপর আক্রমণ বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই অন্ধকারময় দিন কাটিয়ে ওঠা গেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া সফরও সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাবটের সঙ্গে বৈঠক দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে নতুন আশার জন্ম দিয়েছে। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অসামরিক পরমাণু সহযোগিতার বিষয়ে মতৈক্য এই দুই ভারত মহাসাগরীয় দেশের মধ্যে সব কাঁটা সরিয়ে বন্ধুত্বের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অস্ট্রেলিয়ার সংসদে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণে অস্ট্রেলিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন—'Australia is a major partner in every area of our national priority.....Australia will no longer be at the periphery, but at the centre of India's vision'. অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কের বিষয়ে প্রান্তদেশে নয়। থাকবে একেবারে কেন্দ্রস্থলে অসীম গুরুত্ব সহকারে। সিডনিতে প্রায় ষোলো হাজার ভারতীয় মূলের অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকদের সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এই নতুন অগ্রাধিকারের ব্যাপারে তাঁর সদর্থক অভিমত ব্যক্ত করেন। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতার এক নতুন রূপরেখা সমঝোতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। ২০১৫-তে যৌথ নৌবাহিনীর মহড়া এই দুই ভারত মহাসাগরীয় দেশকে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছে নিঃসন্দেহে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যাবটের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, তা ওই 'পুবে কাজ কর' নীতির সফল রূপায়ণের পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলেই গণ্য হবে।

এই 'পুবে কাজ কর' নীতির অন্যতম এক দরজায় রয়েছে বাংলাদেশ। তাই নরেন্দ্র

মোদীর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর এদিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চার দশকেরও বেশি সময় পরে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সম্পন্ন স্থলসীমান্ত চুক্তি ভারতীয় সংসদের অনুমোদন পাওয়ার ফলে এটি একটি মাইলফলক বলে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া দুদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি সম্পর্কে ঐকমত্য আঞ্চলিক যোগাযোগ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যদেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক বৃদ্ধির সহায়ক হবে। এই ঐকমত্য বহুদিন থেকে প্রতীক্ষিত ছিল। শেষপর্যন্ত সব বাধা কাটিয়ে স্থলসীমান্ত চুক্তি বিবাদ-বিসংবাদ দূর করে মৈত্রীর নতুন বাতাবরণ তৈরি করল। বাইশটি (২২) চুক্তি ও সমঝোতা পত্রও স্বাক্ষরিত হল। ১৬২টি ছিটমহলের (ভারতের মধ্যে ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল ও বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল) বিনিময়ের ফলে নাগরিকত্বহীন বাসিন্দাদের দুঃখের দিন অচিরেই শেষ হবে। আর কিঞ্চিদধিক ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমানার অনেক সমস্যারও সমাধান হবে। ২০১১-তে দুদেশের মধ্যে যে প্রোটোকল প্রস্তুত করা হয়েছিল তাও বৈধতা পেল এবং তার আলোকে বেশ কিছু অনির্ধারিত সীমানা ও বেআইনি দখল সম্পর্কিত জটিলতার অবসান হবে।

এই সফরের ভূ-রাজনৈতিক দিকটাও অধ্যয়ন করার মতো। যেটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় শিল্পপতিদের জন্য দুটি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন (মংলা ও ভেড়ামারায়) নির্মাণ, ভারতকে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি সংক্রান্ত সমঝোতাপত্র, ত্রিপুরার জন্য খাদ্যশস্য ও পলাটনা বিদ্যুৎ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দু বিলিয়ন মার্কিন ডলার লাইন অব ক্রেডিট এবং ঢাকা-শিলং-গুয়াহাটি ও কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস পরিষেবা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। এতে কানেকটিভিটি বাড়বে এবং বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের পক্ষে সেতু (ল্যান্ড ব্রিজ) হিসাবে কাজ করবে। তিস্তা ও ফেনি নদীর জলবণ্টনের ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের একটি গুণগত পরিবর্তন হল। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অগ্রাধিকার 'পুবে কাজ কর' নীতিকেই বেগবান করবে।

'পুবে কাজ কর' নীতি পূর্বতন সরকারের 'পুবে তাকাও নীতি'রই একটি উন্নত ও সংশোধিত সংস্করণ এবং এক আশাব্যঞ্জক দিশা। অল্পদিনেই বিশ্বে ভারতের অবস্থান উজ্জ্বলতর হয়েছে, একথা বলাই যায়। ভবিষ্যতে এর অগ্রগতি বোঝা যাবে বিদেশি বিনিয়োগ—প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ এবং কীভাবে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ভারতকে শক্তিশালী করবে তার মাধ্যমে। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হবে।

একথা ঠিক পথ মসৃণ নয়। দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি, বিশেষ করে পাকিস্তানের ভূমিকা, সীমা পারের আতঙ্কবাদকে ঘিরে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক কেমন যাবে তার উপর লক্ষ রাখতে হবে। আবার পশ্চিম এশিয়া—আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন প্রভৃতি দেশের পরিস্থতির উপর ওই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে। এই অনিশ্চয়তার জন্য পশ্চিম দিক থেকে বিপরীতমুখী টানের আবহ তৈরি করতে পারে। তাই 'পুবে কাজ কর' নীতির সফল রূপায়ণ তখনই সম্ভব যখন বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে কূটনৈতিক মুনশিয়ানা দেখানো যাবে।

সর্বোপরি, ভারতের ধারাবাহিক আর্থিক প্রগতি একটি সফল অনুঘটকের কাজ করতে পারে। তাই বলা হয় যে, ভারতের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের হার বৃদ্ধি একান্তভাবেই জরুরি। ভারতের অর্থমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে সময়োচিত ও বাস্তব কথাটি বলেছেন—'China recorded 9% growth for thirty-three years, while the Indian growth story has just started. .....China says its growth rate normalised at 7%. International experts say it is 6.5%. But as China stabilises around 7%, the Union Government's priorities are to draw foreign investments and raise the growth rate.'

অর্থাৎ চীনের আর্থিক বৃদ্ধির হার দেখে ভারত সরকারের অগ্রাধিকার হল অধিকতরও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা ও উন্নয়নের হার বাড়ানো।

এই প্রসঙ্গেই ভারতের পুবের দেশগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক একটি মূল্যবান উপাদানের জোগান দিতে পারে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, যথা, পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলন, আসিয়ান আঞ্চলিক মঞ্চ (আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম) প্রভৃতির মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ যুগের দাবি। এই নতুন ভূমিকা স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

পরিশেষে, 'পুবে কাজ কর' নীতিটি আগেকার 'পুবে তাকাও' নীতির নতুন মোড়কে মোড়া একই নীতি নয়। জোড়া হয়েছে নতুন প্রেক্ষিত, নতুন সক্রিয়তা ও মাত্রা। এটি একটি নতুন দিশা। 'পুবে কাজ কর' নীতির বাস্তবায়ন তাই সহজ নয়। বরং সঠিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ যে একান্তই জরুরি, তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।❑

[লেখক প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল, সমাচার, আকাশবাণী এবং প্রাক্তন প্রেস রেজিস্ট্রার, ভারত সরকার
email : bandyopk@yahoo.co.in
website : www.pradiptobandopadhyay.com]

বহুপাক্ষিকতার পশ্চাদপসরণ

আঞ্চলিক সহযোগিতাই কি সামনের পথ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা ঠান্ডা যুদ্ধের যুগ আবার ফিরে আসছে কি না, পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন লেখক **দিলীপ সিনহা**। *বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব হ্রাস, আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা, জি সেভেন, জি টোয়েন্টির মতো দেশগোষ্ঠীর বর্তমান পরিস্থিতি, রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের কূটনীতি, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্যের মতো বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ও স্থান করে নিয়েছে এই পরিসরে।*

পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং ধারাবাহিক বিশ্বজনীন আর্থিক সংকট, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর ছাপ ফেলছে, পথরোধ হচ্ছে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির। নয়ের দশকের গোড়ায় বিশ্বায়ন ও গণতন্ত্র নিয়ে যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল, আজ তা ফিকে হয়ে এসেছে। সর্বগ্রাসী বেকারত্ব, ক্রমশ বাড়তে থাকা অসাম্য এবং ধর্ম নিয়ে সংঘাত, বিশ্বায়নের কট্টর সমর্থকের উৎসাহকেও বেশ কিছুটা চুপসে দিয়েছে।

উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা সত্ত্বেও আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, দক্ষিণ সুদানের মতো দেশগুলিতে সুস্থিতি আনতে ব্যর্থ হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল, ধাক্কা খেয়েছে তাদের হস্তক্ষেপমুখী নীতি। পশ্চিমি দেশগুলির উদ্দেশ্য নিয়ে আপাদমস্তক সন্দিহান না হলেও, উন্নয়নশীল দেশগুলি এখন অনেক সতর্ক। অশান্ত দেশগুলির অস্থিরতা জন্ম দিয়েছে মানবিক বিপর্যয় ও উদ্বাস্তুস্রোতের।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির উত্থান বিশ্ব শান্তির সামনে এক বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা এতটাই শক্তিশালী যে, কোনও এলাকা দখল ও অধিকার করে রাখতে পারে। এদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও অর্থ সংগ্রহের জাল এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বিস্তৃত। বর্তমান বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত হয়েছিল। ঠান্ডা যুদ্ধ, সামরিক জোট ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে রেষারেষি এরা সয়েছে। কিন্তু এই পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন কি তাদের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল? এরপর আর কোনও নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সামর্থ্য কি এদের আছে?

পূর্ব-পশ্চিম উত্তেজনার পুনরাগমন

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে উত্তেজনা আবার ফিরে এসেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তিকে আজ কেবলই মধ্যবর্তী সময়ান্তর বলে মনে হয়। জার্মানির স্ক্লস এলমাউতে গত ৭ ও ৮ জুন, জি-সেভেন শীর্ষ সম্মেলনে সাতটি পশ্চিমি দেশের রাষ্ট্রনায়করা ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়াকে কড়া বার্তা পাঠিয়েছেন। তাঁরা ক্রিমিয়ার সঙ্গে এর সংযুক্তিকরণ মেনে নিতে রাজি নন। রাশিয়ার খরচ যাতে আরও বাড়ে সেজন্য আরও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নিতেও তারা পিছপা হবে না বলে জি-সেভেন জানিয়েছে। অন্যদিকে রুশ রাষ্ট্রপতি পুতিনও কোনওভাবেই ক্রিমিয়াকে ছাড়তে প্রস্তুত নন। ক্রিমিয়াতে রুশ বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যাই বেশি। ২০১৪ সালের মার্চে বিপুল ভোটাধিক্যে তারা নিজেরাই ইউক্রেনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্ব ইউক্রেনে রুশ বংশোদ্ভূতদের কাছে সহায়তা পাঠানো বন্ধ করার কোনও যুক্তিসম্মত কারণও পুতিন খুঁজে পাননি। পশ্চিমি দেশগুলির সামরিক জোট NATO-কে প্রসারিত করার প্রয়াসকেও রাশিয়া ভালো চোখে দেখেনি। ওয়ারস চুক্তির অন্তত দশটি পক্ষ আজ NATO-র সদস্য। উদ্বিগ্ন রাশিয়া এখন রাজনৈতিক সমর্থন ও বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করছে।

রাশিয়ার ওপর জারি নিষেধাজ্ঞার মূল্য চোকাতে হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও। রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং এর প্রাথমিক জ্বালানি আমদানির এক-তৃতীয়াংশের উৎস। অস্থির মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরতা কমাতে ইউরোপ ক্রমশই রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস আমদানি বাড়িয়েছে। আবার ক্রমবিকাশশীল রাশিয়ায় ইউরোপ খুঁজে পেয়েছে তার দামি পণ্যের লোভনীয় বাজার। দু'পক্ষের বাণিজ্য ২০১২ সাল নাগাদ শীর্ষে পৌঁছোয়। এরপর ইউরোপ, রাশিয়ার ওপর তার জ্বালানি নির্ভরতা কমাবার চেষ্টা করলেও উপযুক্ত বিকল্পের অভাবে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

ঠান্ডা যুদ্ধের প্রথমদিকে চীনকেও পশ্চিমি দেশগুলি নিশানা করেছিল। জি-সেভেন গোষ্ঠীর নেতারা তাঁদের ঘোষণাপত্রে চীনের নাম না করে বলেছিলেন, 'পূর্ব ও দক্ষিণ চীনসাগরে উদ্ভূত উত্তেজনা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি এবং সমুদ্রের মুক্ত, অবাধ ও আইনসংগত ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। যেকোনও ভীতি প্রদর্শন, জবরদখল বা শক্তি প্রয়োগ এবং একতরফাভাবে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের যেকোনও প্রয়াসের আমরা ঘোরতর বিরোধী।'

তাহলে ঠান্ডা যুদ্ধ কি ফিরে এল? বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এখনই তেমন বলতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে ধরনের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন মনে হচ্ছিল। এখনকার পরিস্থিতি মোটেই তেমন নয়। আমরা এখন অনেক বেশি সংহত। অজস্র ধরনের অভিন্ন বাণিজ্যিক স্বার্থ থাকায় আজ

তেমন উন্মাদনা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য দেশগুলি এখনও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের ওপর নির্ভর করে। তবে পারস্পরিক সম্পর্কের উষ্ণতা যে কমতে শুরু করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ায় বিভিন্ন দেশ এখন সহযোগিতার জন্য আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী হচ্ছে।

জি টোয়েন্টি

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকট নিয়ে আলোচনার জন্য এক ডজন বিকাশশীল অর্থনীতির দেশকে পরীক্ষামূলকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এ থেকেই ১৯৯৯ সালে জি টোয়েন্টির সূচনা। ২০০৮ সালে বিশ্বজনীন আর্থিক সংকটের মোকাবিলায় এই গোষ্ঠী কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। এরপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই দেশগোষ্ঠীর বৈঠক হতে থাকলেও এর গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। গত বছরের নভেম্বরে ব্রিসবেনে জি টোয়েন্টি শিখর সম্মেলনের পর যে বার্তা প্রকাশ করা হয়, তাকে কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। এর অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারে কোটা সংক্রান্ত যে সংস্কার নিয়ে ২০১০ সালে মতৈক্য গড়ে উঠেছিল, তা অবিলম্বে রূপায়িত করা। বার্তায় বলা হয়েছিল, 'চলতি বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পাদিত না হলে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।' এই কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ

রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সক্রিয়তা শেষ হয়েছে। পরিষদ ফিরে গেছে মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ অলংকারবহুল প্রস্তাব গ্রহণের পুরানো অভ্যাসে, যদিও সংঘর্ষ থামেনি। পরিষদের শেষ শান্তিরক্ষা অভিযান হয়েছিল ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদানে। সেটাই ছিল শেষ অনুমোদিত সামরিক অভিযান। লিবিয়াতেও সামরিক অভিযান হয়, তবে তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। লিবিয়ার ওপর পশ্চিম নেতৃত্বাধীন জোটের ফেলা বোমা, নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে দু দশকের সহযোগিতার অবসান সূচিত করল। রাশিয়া ও চীন এখনও এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেয়নি। গত বছরের মার্চে সিরিয়ার প্রতি নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাবেও তারা ভেটো দেয় এবং সিরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের অনুমোদন আটকে দেয়।

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারসাধন নিয়েও অগ্রগতি হয়নি। ১৯৯২ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বুত্রোস বুত্রোস-ঘালি 'An Agenda for Peace' শীর্ষক একটি রিপোর্ট, পরিষদে পেশ করেন। এতেই প্রথম সংস্কারের কথা বলা হয়। ২০০৫ সালে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কয়েকজন স্থায়ী সদস্য-সহ অধিকাংশ সদস্য সংস্কারের পক্ষে হলেও এর বিষয়বস্তু নিয়ে সহমত আজও গড়ে ওঠেনি।

জি সেভেনের প্রত্যাবর্তন

পশ্চিমি দেশগুলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য ১৯৭৫ সালে জি সেভেন গঠন করেছিল। পরে রাশিয়াকে এর অন্তর্ভুক্ত করে জি এইট গড়ার পরীক্ষামূলক প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়। ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু ও ছাঁদে এর ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে। রাশিয়ার উপস্থিতির জন্য এর যে ভাষাভঙ্গি ছিল, গত বছর রাশিয়া বহিষ্কৃত হবার পর থেকে তা উধাও। সম্মেলনস্থল সোচি থেকে ব্রাসেলসে সরিয়ে আনা হয়। জি সেভেনের ঘোষণাপত্রে এখন রাশিয়া ও চীনকে নিশানা করার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলির দাবি নিয়ে অবস্থান কঠোর করা হয়েছে।

এলামাউতে জি সেভেনের ঘোষণাপত্র পশ্চিমি দেশগুলির আলোচ্যসূচি স্থির করে দিয়েছে, যদিও এ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা পশ্চিমি দেশগুলির আদৌ আছে কি না, তা সংশয়াচ্ছন্ন। এক্ষেত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনার উদাহরণ দেওয়া যায়। বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের ১৫ বছরের পুরনো দোহা আলোচনা তার গুরুত্ব হারাতে চলেছে। পশ্চিমি দেশগুলি বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তি দ্রুত অনুমোদনের ডাক দিলেও অন্য বিষয়গুলি নিয়ে আদৌ কোনও তৎপরতা দেখায়নি।

এলামাউ ঘোষণাপত্রে বহুপাক্ষিক চুক্তির কথা বলা হয়েছে যাতে নির্বাচিত গোষ্ঠীর দেশগুলি নিজেদের মধ্যে তা স্বাক্ষর করতে পারে। বলা হয়েছে, 'বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে মজবুত করে তোলার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি আমরা দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলিকেও স্বাগত জানাচ্ছি। এর মধ্যে রয়েছে পরিষেবা বাণিজ্য চুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তার চুক্তি, পরিবেশ সংক্রান্ত পণ্য চুক্তি।' এছাড়া আন্তঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশীদারিত্ব এবং আন্তঃ অতলান্তিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদারিত্বকেও স্বাগত জানানো হয়েছে। এই চুক্তিগুলি 'স্বচ্ছ, উচ্চমানসম্পন্ন ও সার্বিক' এবং 'বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ' হবে বলে ঘোষণাপত্রে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কূটনীতি

প্যারিসে এ বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিতব্য 'ইউ এন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' UNFCCC-এর একবিংশতম সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। একটি নতুন চুক্তি সম্মেলনে চূড়ান্ত হতে পারে যেখানে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে প্রতিটি দেশের 'জাতীয় স্তরে স্থির করা কাম্য অবদান' আনুষ্ঠানিক চেহারা পাবে। ঘোষিত লক্ষ্য হল, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রাকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে না দেওয়া। কিন্তু বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাকৃত এই 'অবদান' কীভাবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে পারবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এজন্য ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ কার্বন নির্গমন কমানো দরকার বলে IPCC-র হিসাবে প্রকাশ।

১৯৯২ সালে UNFCCC-র সম্মেলনে 'অভিন্ন কিন্তু পৃথক মাত্রার' যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা যে অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব নয়, তা এখন স্পষ্ট। ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রোটোকলে নির্দিষ্ট করা, ওপর থেকে নীচে কার্বন নির্গমন লক্ষ্যের বিষয়েও একই কথা বলা চলে। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য যাদের সম্মিলিত কার্বন নির্গমন দায়ী, সেই উন্নত দেশগুলি নতুনদের জন্য জায়গা ছাড়তে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ নতুন যারা আসছে, তাদের সীমিত বায়ুমণ্ডলীয় পরিসরেই মানিয়ে নিতে হবে। পরিবেশ-

বান্ধব প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও তাদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। বাণিজ্যিক হারে তাদের এই প্রযুক্তি কিনতে হবে। ২০০৯ সালে কোপেনহাগেন শীর্ষ সম্মেলনে নতুন চুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি যে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তারা রাখে কি না, সেটাই এখন দেখার। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যে তাদের বিকাশের পাশাপাশি কঠোর কার্বন নির্গমন নীতি ও ঊর্ধ্বসীমা মেনে চলার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে, সেটা একেবারেই স্পষ্ট।

এই ধরনের বিশ্ব পরিবেশ নীতি মোটেই উন্নয়নমূলক সহযোগিতার সহায়ক নয়। ভারতের মতো যেসব দেশ বিদেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানির বাজারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে, তাদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উন্নত দেশগুলি শুধু যে সাহায্য দিতে অনিচ্ছুক তাই নয়, তারা তাদের বাজার উন্মুক্ত করে দিতেও গররাজি। বিশেষত, কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এটা খুব চোখে পড়ে। তারা নানা সুকৌশলী উপায়ে তাদের সংস্থাগুলিকে প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচায়। কখনও পরিবেশ, কখনও শ্রম আইন, কখনও বা মেধাস্বত্বের দোহাই দিয়ে জোরালো করে তোলে নিজেদের অজুহাত।

ভারতের প্রতিবেশী কূটনীতি

বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলির সংস্কারসাধনের পক্ষে পরিবেশ এখন অনুকূল নয়। বিভিন্ন দেশ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় আঞ্চলিকগোষ্ঠী গঠনের দিকে ঝুঁকেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তুলছে। ভারতের বিদেশ নীতিও এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বকেয়া সীমান্ত সমস্যা মেটানোর পাশাপাশি বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালকে নিয়ে চতুর্দেশীয় যান পরিবহণ চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে ভারত।

ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশ ছাড়াও এ বছরের শেষের দিকে ৫৪টি আফ্রিকী দেশকে নিয়ে ভারত-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। ১৯৮৩ সালের জোট নিরপেক্ষ শিখর সম্মেলনের পর এটিই হবে ভারতে বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের সর্ববৃহৎ জমায়েত। চীন যেভাবে আফ্রিকী দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেয় এবং চীনা সংস্থাগুলি যেভাবে সেখানে পরিকাঠামোগত প্রকল্পে সহযোগিতা করে, ভারত তা পেরে ওঠে না। মানবসম্পদ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভারতের শক্তি। তাই দিয়েই ভারত পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ব্রিকস

ব্রিকসে ভারত বিশেষভাবে সক্রিয়। ব্রিকস উন্নয়ন ব্যাংক গড়ে তোলার যে প্রস্তাব ভারত দিয়েছিল, তা গৃহীত হয়েছে। আগামী বছর থেকেই, এটি কাজ শুরু করবে বলে আশা করা যায়। এর প্রথম সভাপতি হবেন ভারতেরই কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ৫০০০ কোটি ডলার মূলধন তহবিলের এই ব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের প্রয়োজন মেটাতে অর্থ সঞ্চিতির ব্যবস্থাও এখানে রাখা হয়েছে।

পশ্চিমি দেশগুলি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্যদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না দেওয়ায় ব্রিকস ব্যাংক স্থাপন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি খেয়ালখুশিমতো পরিবেশ ও মানবাধিকার সংক্রান্ত শর্তাবলি আরোপ করছিল, তা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বিরক্ত করে তোলে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা বিস্তারের ক্ষেত্রে অবশ্য ভারত একা নয়। চীন তার নবলব্ধ অর্থনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করে এশীয় পরিকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক গড়ে তুলেছে। ভারত-সহ ৫৭টি দেশ এর সদস্য। এর মূলধন ভিত্তি ১০,০০০ কোটি ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের বদলে আমেরিকা, ওসিয়ানিয়া ও এশিয়ার নির্দিষ্ট কিছু দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাইছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

বহুপাক্ষিকতাকে সমর্থন ও উৎসাহ জোগানোর দীর্ঘ ঐতিহ্য ভারতের রয়েছে। বিশেষত, রাষ্ট্রসংঘের দিকে ভারত বরাবরই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবারও ভারত সারা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করার এমন এক পথের সন্ধান দিয়েছে, যা একইসঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক। বিশ্বজনীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া কখনওই সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক সংস্থা, দেশ, ব্যক্তি—সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেকে এই বিষয়ে কী করতে পারেন, তা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি। ভারতের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন এই লক্ষ্যে এক ছোট্ট পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক সহমত গড়ে তুলে একটি জাতীয় ধারণাকে বহুপাক্ষিকতার মাধ্যমে প্রসারের এ এক চমৎকার নিদর্শন। এই প্রয়াসে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ভারতের আনা এই প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতা করে রেকর্ড সংখ্যক ১৭৫টি দেশ। সর্বসম্মতিক্রমে এটি গৃহীত হয়।

অনুচ্চ, মসৃণ, সহানুভূতিশীল কূটনীতির মধ্য দিয়ে একটি দেশ কীভাবে দশক জুড়ে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রসংঘের অভিমুখ পালটে দিতে পারে, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী স্থিতাবস্থার রক্ষক থেকে কীভাবে তাকে পরিবর্তনের প্রতিনিধিতে রূপান্তরিত করতে পারে, বর্ণবৈষম্যের মতো অভিশাপকে দূরে সরিয়ে কীভাবে উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া যায়—ভারতের প্রয়াস তারই নিদর্শন। প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে ধ্বস্ত পৃথিবীতে এই সুপ্রাচীন ভারতীয় দর্শন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার মন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছে। স্বভাবতই যুব সম্প্রদায় এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার মানুষজন এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

আঞ্চলিক স্তরের সহযোগিতা কতটা সফল হবে, তা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির পালের হাওয়া যে এরা কেড়ে নিয়েছে, তা বলাই যায়। বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলি বাঁচাবার দায় এখন পশ্চিমি দেশগুলির। নতুন আন্তর্জাতিক বাস্তবতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এদের পুনরুজ্জীবন না ঘটাতে পারলে অচিরেই এগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।❑

[লেখক রাষ্ট্রসংঘে (জিনিভায়) এবং গ্রিসে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।
email : dilipsinha@hotmail.com]

ভারত ও তার প্রতিবেশীরা

গত এক বছরে একটা জিনিস আমরা সবাই লক্ষ করেছি যে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী একের পর এক বিদেশ সফরে নিযুক্ত। হোক না তা ভুটানের মতো ছোট্ট দেশ কি প্রতিপত্তিশালী আমেরিকা—একের পর এক ঘুরেছেন তিনি। উদ্দেশ্য অবশ্যই নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা বা পুরনো বন্ধুত্ব জোরদার করা যাতে ভারতের আর্থিক অগ্রগতি জোরদার হয়, তার অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুস্থিতি বিপন্ন না হয় ইত্যাদি। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে গত এক বছরে সুসম্পর্ক বজায় রাখবার ক্ষেত্রে ভারত কতদূর কী করল তা জানাচ্ছেন **স্নেহাশিস সুর।**

বর্তমান সরকারের প্রথম বছরের শাসনকালে বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে যেমন বড় (বৃহৎ শক্তিধর) দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে তেমনই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নকেও বৈদেশিক নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে মোদী সরকার।

প্রধানমন্ত্রীর শপথে সার্ক রাষ্ট্রনায়কদের উপস্থিতি

নতুন সরকারের সূচনালগ্নে একে একটা বড় চমক তথা সাফল্য বলে ধরা যেতে পারে। সেই সঙ্গে এই ঘটনাটা এ-ও বুঝিয়ে দেয় যে নতুন সরকারের অগ্রাধিকার কী। আমন্ত্রণ জানানোটা যদি কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা হয়, তাহলে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অল্প সময়ের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াটাও তার পরবর্তী ইতিবাচক পদক্ষেপ তো বটেই। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ, শ্রীলঙ্কার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি মহীন্দ্র রাজাপক্ষ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালা, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবাগ, আফগানিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা ইয়ামিন আবদুল গাইউম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সময়ে পূর্ব নির্ধারিত জাপান সফরে থাকায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন সেদেশের সংসদের অধ্যক্ষ শিরিন চৌধুরি। কালের গতিপথে এই এক বছরে শ্রীলঙ্কা আর আফগানিস্তানে রাষ্ট্রনায়ক বদল হয়েছে তবে নতুনরাও ইতিমধ্যে ভারতে এসেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা শুরু ভুটান দিয়ে

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার পর নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রার গন্তব্য হিসেবে বেছে নেন ভুটানকে। ভুটান ছিল দ্বিপাক্ষিক সফর। কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর শিখর সম্মেলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশে যাত্রা নয়। ফলে, বিদেশ সফরের প্রথম দেশ হিসেবে ভুটানকে বেছে নেওয়া নিঃসন্দেহে ভারত ভুটান সম্পর্কের এক নতুন মাত্রা এনে দেয়।

আর্থ সামাজিক সহায়তা দানের প্রেক্ষিতে ভারত ভুটানের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভুটানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভারতের কাছে ভুটানের গুরুত্ব যথেষ্ট। বর্তমান আর্থিক বছরে ভুটানকে ভারতের সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। ভুটানের একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের বরাদ্দ বৈদেশিক সাহায্য আরও ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। এছাড়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের সাহায্যের পরিমাণও যথেষ্ট বেশি।

তাঁর প্রথম সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের অর্থানুকূল্যে নির্মিত ভুটানের সুপ্রিম কোর্ট ভবনের উদ্বোধন করেন এবং তথ্যপ্রযুক্তি এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রসারে ভারতের দিক থেকে আরও সহায়তার আশ্বাস দেন। ভুটান কিন্তু বিগত শতাব্দী পর্যন্ত বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া জীবন ধারণের পক্ষে ছিল। সে দেশে ইন্টারনেট আসে বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে। তবে বর্তমানে সে দেশ রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হবার পর বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতের সহায়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভুটান সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে দেন যে ভুটানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একেবারে স্বতন্ত্র এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ভুটান সম্পর্কের আন্তরিকতা, গভীরতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বোঝাতে গিয়ে বলা হয় সমস্তরকম আবহাওয়াতেই ভারত ও ভুটান বন্ধু, বলা হয় দু'দেশের বন্ধুত্ব হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক, কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদর্শ স্বরূপ এবং দু'দেশ হচ্ছে বিশেষ ধরনের সহযোগী। ভারত-ভুটান সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন মন্ত্র B4B অর্থাৎ ভুটানের জন্যে ভারত ও ভারতের জন্যে ভুটান। নিঃসন্দেহে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

নেপাল

ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয় কিছু বলতে গেলেই নেপালের সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্পে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে ভারতের সক্রিয়, সহৃদয় সহযোগিতার কথা দিয়ে অবশ্যই শুরু করা উচিত। ভারতের তাৎক্ষণিক ও আন্তরিক প্রতিক্রিয়া সমস্ত

দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণকে ছাড়িয়ে প্রতিবেশী দেশের প্রতি আরেক প্রতিবেশী দেশের কর্তব্যের একটি আদর্শ হিসেবে দেখা দেয়। এছাড়াও ভারত নেপালের পুনর্গঠনের জন্য এক বিলিয়ান মার্কিন ডলার (প্রায় ৬,৩৬০ কোটি টাকা) সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিগত এক বছরে দু-বার নেপাল সফর করেছেন। গত আগস্ট ২০১৪-তে তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক নেপাল সফর ছিল গত ১৭ বছরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সেদেশ সফর। এই সফর কিন্তু সাধারণ নেপালি জনগণের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। দেশের নির্মীয়মাণ সংবিধানের প্রতি আস্থা জানিয়ে সে দেশের গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ নেপালি মানুষকে আপ্লুত করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিটি বিদেশ সফরেই থাকে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পরম্পরার কিছু স্পর্শ। ফলে নেপালে প্রধানমন্ত্রী নিয়ে যান বুদ্ধগয়া থেকে বোধিবৃক্ষের চারা যা লুম্বিনীতে অশোকস্তম্ভের পাশে পোঁতা হয়। সেই সঙ্গে বৌদ্ধ তীর্থপথ তৈরিতে দু'দেশের শহরগুলিকে যুক্ত করার একটা প্রয়াসও শুরু হয়।

নভেম্বর ২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেপাল যান সার্ক শিখর সম্মেলনে যোগ দিতে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ-এর সফরের মধ্যে দিয়ে ২৩ বছর পর ভারত-নেপাল যৌথ কমিশন আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। ভারত নেপালকে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে বিদ্যুৎ, সড়ক ইত্যাদি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য। নেপালের পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে ভারত সাহায্যের অঙ্গীকার করে। কাঠমান্ডু-দিল্লি, কাঠমান্ডু-বারাণসী ও পোখরা-দিল্লির মধ্যে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

শ্রীলঙ্কা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র শ্রীলঙ্কা সফর ভারত শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক বিশেষ দিক উন্মুক্ত করেছে। ২৮ বছর পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সে দেশে দ্বিপাক্ষিক সফরে গেলেন। ভারত ও শ্রীলঙ্কা দু'দেশেই নতুন সরকার এসেছে। সে দিক দিয়ে বিচার করতে গেলেও এই সফরের গুরুত্ব যথেষ্টই। শ্রীলঙ্কার তিন দশকের গৃহযুদ্ধের অবসানের পর সে দেশের পুনর্গঠনে ভারতের সক্রিয় যোগদানের বিষয়টি এই সফরের পর অঙ্গীকার থেকে বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পথে এগিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরে যেসব নতুন চুক্তি বাস্তবায়িত হয় তার মধ্যে প্রায় ৩২ কোটি ডলারের অতিরিক্ত রেল সহায়তা প্রকল্প, শ্রীলঙ্কার টাকাকে শক্তিশালী করার জন্য ১৫০ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান, ভারত-শ্রীলঙ্কা পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর, সামুদ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠন প্রভৃতি রয়েছে। ওই সফরের অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জাফনায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত তামিলদের জন্য ৫০ হাজার গৃহ নির্মাণ এবং শ্রীলঙ্কার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তালাইমান্নার থেকে মাদুরোড পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ। এই রেলপথ নির্মাণের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এতদিন ভারতের সহায়তা মূলত শ্রীলঙ্কার উত্তরভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রথম ভারত-শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে রহুনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামাঙ্কিত একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করবে এবং ওই অঞ্চলে রেল চলাচলের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে।

বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সাফল্যকে এককথায় বহুমাত্রিক বলা যায়। দু'দেশের মানুষের মধ্যে যে হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে সেদিকটাও যেমন নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করেছেন তেমনি কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে অনেক কিছু যা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ছিল তা এই সফরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর শুরু হয় সাভারে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং ধানমুণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর যে বাসভবনে তিনি নিহত হয়েছিলেন সেখানে এখন যে স্মৃতি-সংগ্রহশালা রয়েছে সেখানে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানুষের কাছে হৃদয়স্পর্শী। দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচির সূচনায় ঢাকেশ্বরী মন্দির ও ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে যান তিনি। বাংলাদেশের সব ধরনের মানুষের প্রতি, বিশেষত সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি এবং বাংলাদেশ সরকার ও প্রশাসনের প্রতি এটি এক সুস্পষ্ট বার্তা পাঠায়।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সুদীর্ঘ আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তার প্রতি নরেন্দ্র মোদী সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়িকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদী প্রথম বলেন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে অটলবিহারী বাজপেয়ি যে সত্যাগ্রহ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র তখন একজন তরুণ কর্মী হিসেবে তাতে যোগ দেন। ১৯৭২ সালের ৬ ডিসেম্বর সংসদে অটলবিহারী বাজপেয়ি প্রদত্ত বক্তৃতার উদ্ধৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী। অটলজি বলেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সে দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের রক্ত একসঙ্গে ঝরেছে—ফলে দু'দেশের সম্পর্ক রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ—সেই বন্ধন যেন বাইরের কোনও শক্তি কোনওভাবে ভাঙতে না পারে তা আমাদের দেখতে হবে। এই উক্তির মধ্যে দিয়ে দু'দেশের সম্পর্কের গভীরতার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনই বহির্শত্রুর বিনাশকারী ভূমিকার আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছে। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের জানাতে গিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এস জয়শঙ্কর বলেন দুই নেতার মধ্যে গণতন্ত্রের কথা উঠতেই ভারত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে গণতন্ত্রের প্রতি ভারত নিঃসন্দেহে দায়বদ্ধ। সেই সঙ্গে এও জানানো হয় যে ভারত উগ্রপন্থা এবং মৌলবাদের ঘোর বিরোধী। সুতরাং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য কোনও দেশ যদি উগ্রপন্থা ও মৌলবাদকে হাতিয়ার করে ভারত তা বরদাস্ত করবে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সে দেশের

বিশিষ্ট জনগণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যে ভাষণ দেন তাতেও ছিল আবেগের ছোঁয়া। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, মহিলাদের অগ্রগতি, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সাফল্য প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, শুধু পাশাপাশি থাকলেই হবে না একসঙ্গে চলতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ উন্নতি করলে ভারত নিঃসন্দেহে তার সুফল পাবে।

শুধু আবেগ নয়; নিঃসন্দেহে প্রাপ্তির হিসেবটা সকলেরই দেখতে ইচ্ছে করে। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা জমি হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়াটা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ফলে দু'দেশের ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারী পরিবারগুলি এবার নাগরিকের মতো বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সুযোগ পাবে। আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতার বাস পরিষেবা এবং গুয়াহাটি থেকে শিলং হয়ে ঢাকা বাস পরিষেবার সূচনা প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরের আরেকটা বড় পাওয়া। স্বাক্ষরিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে ২২টি চুক্তি। অবশ্য তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলেও প্রধানমন্ত্রী নিজে থেকে বিষয়টি নিয়ে আশ্বাসন দিয়েছেন। এটিও নিঃসন্দেহে অগ্রগতির দিকে একটা বিরাট পদক্ষেপ।

আফগানিস্তান

আফগানিস্তানে ক্ষমতা বদলের পর নতুন সরকারের সঙ্গে ভারত দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং সে দেশের উন্নয়নে ভারতের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সে দেশের উন্নয়নে ভারত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রূপায়ণ করতে চলেছে।

গত বছর তদানীন্তন আফগান রাষ্ট্রপতি হামিদ কারাজাই ভারতে আসেন, উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি সে দেশে যান এবং নতুন আফগান রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আশরফ গণি ভারতে আসেন। এছাড়া আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা বদলের পর প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সে দেশে গিয়ে নতুন রাষ্ট্রপ্রধান এবং মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক ডঃ আবদুল্লা আবদুল্লার সঙ্গে যে বৈঠক করেন তা দু'দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ আস্থা এনে দেয়।

ভারত ও আফগানিস্তানের যৌথ উদ্যোগে ইরানের চাবাহার বন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে যা এই অঞ্চলের অর্থনীতি ও বাণিজ্যে বিশেষ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মালদ্বীপ

গত বছর ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে দুটি বৈঠক হয়। প্রথমটি, যখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ মালদ্বীপের রাজধানী মালে যান এবং পরেরটি যখন সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুনিয়া মামুন নতুন দিল্লি আসেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বর্তমান বছর হচ্ছে ভারত-মালদ্বীপ কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তী।

বিগত বছরে ভারত মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তা হল ওই দ্বীপরাষ্ট্রে যখন পানীয় জলের সংকট দেখা দেয় তখন 'অপারেশনস নীর'-এর মাধ্যমে ভারত জাহাজে ও বিমানে সে দেশে পানীয় জল পাঠানো।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও সে দেশ সফরের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু মালদ্বীপের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করা হয়।

মায়ানমার

ভারত আশিয়ান বৈঠকে অংশ নিতে প্রধানমন্ত্রী মায়ানমারের রাজধানী নে পি তাও যান এবং ওই অবসরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি নোবেলজয়ী নেতৃ আন সান সু-কি-র সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

ভারতের 'লুক ইস্ট' নীতি থেকে আরও অগ্রসর হয়ে 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে মায়ানমারের একটা বড় ভূমিকা আছে। সে দেশের কালাদান বহুমুখী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের দ্রুত অগ্রগতিতে আঞ্চলিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এর সঙ্গে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এছাড়া বিভিন্ন ভারতীয় উগ্রপন্থী সংগঠন যাতে ভারত-মায়ানমার সীমান্ত ও মায়ানমারের পার্বত্য অঞ্চল ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়েও ভারতের যথেষ্ট চিন্তা রয়েছে। অন্যদিকে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে সীমান্ত হাট-এর সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি নিয়েও আলোচনা চলছে।

ভারত-মায়ানমার সীমান্ত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠন শিবির চালায়। এই রকমই একটি জঙ্গী সংগঠন সম্প্রতি মণিপুরে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর ২০ জন জওয়ানকে হত্যা করে। এটা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বড় ঘটনা। ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারত-মায়ানমার সীমান্তে অভিযান চালায়। পরে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও পদস্থ নিরাপত্তা আধিকারিকরা সে দেশ সফর করেন।

পাকিস্তান

ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পাকিস্তান হয়ে ওঠে তার কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, ক্ষমতা বদল, উগ্রপন্থা, দীর্ঘদিনের ভারত বিদ্বেষী মনোভাব, অনুপ্রবেশ, অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘন, সীমান্তের এদিকে বিনাপ্ররোচনায় অত্যাচার করা, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার অতি সক্রিয়তা, মৌলবাদ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য ভারতের দিক থেকে সম্পর্ক উন্নয়নের বিভিন্ন সদর্থক প্রয়াস ঠিক তার যোগ্য প্রত্যুত্তর পায় না বা বরঞ্চ যা পেয়েছে তা অনভিপ্রেত।

দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে ট্রাক-টু ডিপ্লোমেসির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। নিঃসন্দেহে তা বাড়ছে কিন্তু সম্পর্কের উন্নতিতে এই ট্রাক-টু ডিপ্লোমেসি কতটা কাজে লাগছে তা বলা শক্ত।

চীনের ভূমিকা

ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কের বিষয় অত্যন্ত আন্তরিক এবং বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ-গ্রহণ করে। তবে বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কূটনীতির যে বিষয়টির প্রতি ভারতকে সদা সতর্ক থাকতে হয় তা হল চীনের সঙ্গে সেই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শুধু নয় সেই প্রতিবেশী দেশের ওপর চীনের প্রভাব প্রতিপত্তি।

এটা ভুটান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখা গেছে। আসলে একবিংশ শতাব্দী এশিয়ায় এশিয়ান টাইগার হিসেবে ভারত ও চীন উভয়েই সারা বিশ্বে একটা বড় জায়গা করে নিতে চাইছে। বিশেষত বাণিজ্যিক প্রসারের ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি যেমন একটা বড় ব্যাপার এবং সস্তার চীনা দ্রব্য যেভাবে ভারত-সহ তার প্রতিবেশী দেশগুলির বাজার ছেয়ে ফেলছে সেটা ভারতের কাছে অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। তেমনই ভারতের বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশে বন্দর-সহ বিভিন্ন বড় পরিকাঠামো নির্মাণে চীনের ভূমিকাও ভারতকে সে বিষয়ে নজর দিতে বাধ্য করছে। যদিও শ্রীলঙ্কায় নির্মীয়মাণ একটি বড় বন্দর প্রকল্প আপাতত স্থগিত হয়ে গেছে।

ভারত ও ভারত মহাসাগর

একান্ত অর্থে লাগোয়া প্রতিবেশী ছাড়াও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তিরক্ষা, উন্নয়ন, নজরদারি ও জলদস্যু নিধনে এই অঞ্চলের দেশগুলির প্রতি ভারত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, সেশেল্‌স প্রভৃতি দেশে প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময়ে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ভারতেও ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলির সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভুবনেশ্বরে আয়োজিত এই সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরাও এতে বক্তব্য রাখেন। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে ভারত কিন্তু ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলির প্রতি তার কর্তব্য বিষয়ে সচেতন এবং তার কাজ সে যথাসাধ্য করে যাচ্ছে।

বিবিআইএন

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষ দিক আবার বিশেষ গুরুত্ব পেল। সেটি হল ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল (বিবিআইএন) যৌথভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা-সহ অন্যান্য বিষয় একসঙ্গে যাতে উন্নতি করতে পারে সেই ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশে তাঁর যৌথ বিবৃতিতেও বিষয়টির উল্লেখ করেন।

এর ফলশ্রুতি হিসেবে গত ৫ জুন ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে যৌথ যান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এর ফলে এই দেশগুলির মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে। কার্যত এক দেশের সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সহজ হবার অর্থনৈতিক সুফল সবকটি দেশই ভোগ করবে। ভারতের পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি এই চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করার পর বলেন, পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এই সবকটি দেশের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ, জলপথ ও আকাশপথ ব্যবহার, বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে।

অন্যদিকে ভারতের 'পূর্বে করো' নীতির অঙ্গ হিসেবে ভারত ও অন্যান্য আসিয়ান দেশ যেমন মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির চুক্তিও স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। এবিষয় সচিব পর্যায়ের বৈঠকে অত্যন্ত ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে।

সুতরাং ভারতের পররাষ্ট্র নীতির দিশা এই বিবিআইএন পরিবহণ চুক্তির মধ্যে দিয়ে বাস্তবায়িত হল। এর সুফল সব দেশই পাবে। তবে শুধু বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুফল নয়, এই ধরনের পদক্ষেপ সার্কের অভ্যন্তরে নতুন নতুন ছোট গোষ্ঠী তৈরি করছে যাতে এই অঞ্চলে পাকিস্তানের ভূমিকা ক্রমশ ভিত্তিহীন হয়ে পড়ছে।

পরিশেষে

সবশেষে একথা বলতে হয় যে ভারত তার পররাষ্ট্র নীতিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি ছাড়া প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভারতের যেভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত ভারত তা করার চেষ্টা করছে। বিশেষত প্রতিবেশী দেশগুলির জমি যাতে ভারত বিরোধী উগ্রপন্থী কার্যকলাপে ব্যবহৃত না হয় ভারত তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

তাছাড়া ভারতের মতো বৃহৎ গণতন্ত্রের প্রতিবেশীদের মধ্যে ভুটান ও নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা বদল ও অন্য দেশগুলি-সহ সবকটি দেশের উন্নয়নই আগামীদিনে সমগ্র বিশ্বে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়াবে, আঞ্চলিক শান্তি সুনিশ্চিত করবে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। আর এই লক্ষ্য অর্জনে ভারত তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে—শুধু সচেতন-ই নয়, সদা সতর্ক-ও বটে।❑

[লেখক দূরদর্শনের প্রবীণ সংবাদদাতা। (মতামত নিজস্ব।)]

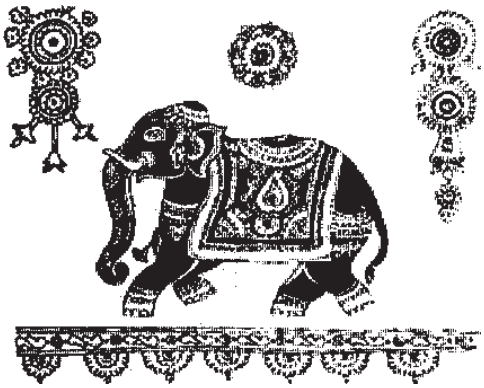

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের হাত ধরে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়া সম্পর্কের সূচনা

কোনও একটি দেশের নিরাপত্তার সম্পর্কিত বিষয়গুলিই ওই দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের রূপরেখা নির্ধারণ করে দেয়। একুশ শতকের পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনও দেশই এই বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারে না। গত বছর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলার মাধ্যমে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে নয়া অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তারই বিবরণ দিয়েছেন **অলোক বনশল।**

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গত এক বছরে বহু অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ভারত। এই সময়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতের ফলাফল সামগ্রিক ভালো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ দেশে যে উন্নতি হয়েছে তাকে সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য বললে মোটেই ভুল বলা হবে না। এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত এক বছরে বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা যে অনেকখানি বেড়েছে তা বললে অত্যুক্তি হবে না। নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক সম্পর্ক— এই বিষয় দুটি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ই যে কোনও জাতি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা নির্ধারণ করে দেয়। নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রধান উপায় নিঃসন্দেহে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তুতি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি বিশেষত দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তুতি আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা কীভাবে এনডিএ সরকারের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকটিকে প্রভাবিত করেছে তার ওপরই আলোকপাত করা হবে এই নিবন্ধে।

এই দেশ সামরিক সরঞ্জামের বৃহত্তম আমদানিকারক হওয়ায় প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ অতীতে দেখা গেছে যে কোনও সংঘর্ষ বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সময় সামরিক সরঞ্জামের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক সময়ে নিয়মনীতি পরিবর্তনের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই চাপ সৃষ্টির জন্যই পোখরান-২ পর্বের পর ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এই ধরনের ঘটনা প্রায়শই প্রতিপক্ষ দেশগুলির তুলনায় ভারতের সামরিক শক্তিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার 'বৃহত্তম সামরিক সরঞ্জাম আমদানিকারক' হিসাবে ভারতের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানের অঙ্গ হিসাবে বিদেশি সংস্থাগুলিকে এ দেশে তাদের উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি বড় বরাত ও সস্তার শ্রম পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে, তেমনই অন্যদিকে ভারতের প্রতিরক্ষাক্ষেত্র অত্যাবশ্যক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম পাওয়ার ক্ষেত্রে আশ্বাস পাবে। সেইসঙ্গে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনই এ দেশে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি আসার পথও খুলে যাবে। তবে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রযুক্তিগুলি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নানা রকম বিধিনিষেধ থাকে। তাই ভারতের সঙ্গে এই প্রযুক্তি আদান-প্রদানের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি যাতে দূর করা যায় সেজন্য সরকারকে অন্যান্য দেশের সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা জারি রাখতে হবে।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার ঠিক পরই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং ভারতের বৃহৎ প্রতিরক্ষাবাহিনী যে প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে কোনও বিপদের কারণ নয়, বরং যেকোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য বিপর্যয়ে তাদের সহায়তার অন্যতম মাধ্যম তাও জানানো হয়েছে। এই কথা মতো, বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালে প্রাণ ও উদ্ধারকার্যে পুরোভাগে থেকেছে ভারতের সামরিকবাহিনী। একইভাবে ইরাক ও ইয়েমেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকেও প্রতিবেশী দেশগুলির নাগরিকদের উদ্ধার করেছে ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী। গত এক বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যমান কৌশলগত সম্পর্কগুলিকে আরও জোরদার করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ সফরের গন্তব্য ছিল জাপান। এই সফরে তিনি ভারত-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'বিশেষ কৌশলগত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা'র স্তরে উন্নীত করে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের বিষয়ে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেন। ভারত ও জাপান তাদের প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও 'উন্নত' ও 'জোরদার' করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি সামরিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। এছাড়াও, জাপানি ইউএস-২ অ্যাম্ফিবিয়ান বিমান (স্থল ও জল উভয়পৃষ্ঠ থেকে টেক-অফে সক্ষম বিমান) বিক্রয়ের আনুষ্ঠানিকতা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা দ্রুত সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই দুই দেশ। এই দুই দেশ যে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও

সরঞ্জাম ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ-সহ সামগ্রিকভাবে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর যে বিশেষ জোর দিয়ে বিষয়টিকে নতুন দিশা দিতে চায় যৌথ বিবৃতিতে তা স্পষ্ট। সেইসঙ্গে, শান্তি, স্থিতাবস্থা রক্ষা তথা সামুদ্রিক নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দুই দেশই তাদের ঐকান্তিক আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছে।

হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল) ও অন্য পাঁচটি ভারতীয় সংস্থার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে জাপান। প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালে পরমাণু বোমা পরীক্ষা পর্বের পর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এছাড়া, দুই দেশ নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক নৌ-মহড়া আয়োজনে সম্মত হয়েছে এবং জাপান ভারত-মার্কিন মালাবার নৌ-মহড়া পর্বে অংশগ্রহণ জারি রাখতে রাজি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানের শামিল হওয়ার জন্য জাপানি শিল্পমহলের কাছে আহ্বান জানিয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

এর পর থেকে প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর সমস্ত বিদেশ সফর তথা বিদেশি প্রতিনিধিদের ভারত সফরের সময় প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রধান সাফল্যগুলির কথা এবার তুলে ধরব।

ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা বিশ্বের মোট ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেই ব্যয় করে থাকে। সেইসঙ্গে, প্রযুক্তির বিষয়ে এই দেশের সুনাম ও খ্যাতি প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে একে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আলোচ্য বছরে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য একটি নতুন কাঠামো চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তিতে 'ভারতের সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ' গ্রহণের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ বছর জানুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভারত সফরের সময় দশ বছরের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তিটির পুনর্নবীকরণ করা হয় এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব অ্যাশ কার্টারের ভারত সফরের সময় চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও এই সফর চলাকালীন জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্রের হাত থেকে সৈন্যদের রক্ষা করতে যৌথভাবে বিশেষ ধরনের সুরক্ষামূলক বর্ম তৈরির একটি চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগে জেনারেটর নির্মাণের জন্য অপর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে দু পক্ষের মধ্যে। দুটি দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যোগাযোগ সম্প্রসারিত করার অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে এই প্রকল্প দুটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে রাশিয়াকে পেছনে ফেলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছের সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রের প্রধান সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সৈন্যদের জন্য সুরক্ষামূলক বর্ম নির্মাণ ও যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী পরবর্তী প্রজন্মের বিদ্যুতের উৎস নির্মাণ সংক্রান্ত উপরোক্ত প্রকল্প দুটির প্রতিটিতে ১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হবে এবং এই আর্থিক দায়িত্ব দুটি দেশ নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেবে।

এছাড়া, ড. কার্টার প্রতিরক্ষা সচিব হওয়ার আগেই প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগের আওতায় র‍্যাভেন মিনি ইউএভি এবং সি-১৩০ জে সামরিক পরিবহণ বিমানের জন্য নজরদারি মডিউল সংক্রান্ত অপর দুটি প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। গত তিন দশক আগে ব্রিটেনের কাছ থেকে আমদানি করা বিমানবাহী জাহাজ (এয়ারক্র্যাফ্ট কেরিয়ার) পুরোনো হয়ে পড়ায় ভারত তার পরিবর্তে নতুন বিমানবাহী জাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এই 'কেরিয়ার' থেকে 'এয়ারক্রাফ্ট লঞ্চিং' প্রযুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কীভাবে নেওয়া যায় তা খতিয়ে দেখছে ভারত। প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে দুপক্ষ একটি কর্মীগোষ্ঠী গঠন করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা-সহ অন্যান্য মার্কিন সংস্থা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানে শামিল হয়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারতে তাদের উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর আশা, এই উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত হবে।

ভারত-ফ্রান্স প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও রাফালে চুক্তি

প্রতিরক্ষা সহযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স সফর ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওঁলাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের জৈটাপুরে মাঝপথে আটকে পড়া পরমাণু প্রকল্পটির ওপরও একটি চুক্তি রয়েছে। জৈটাপুর প্রকল্পকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্বর করে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় সংকোচ করতে লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো এবং অ্যারেভার মধ্যে একটি সমঝোতাপত্রও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ভারতে দেশীয় প্রযুক্তিভিত্তিক পরমাণু শক্তি শিল্প বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। এছাড়াও, এই পরমাণু কেন্দ্রের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সমস্ত ব্যাপারে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য এনপিসিআইএল এবং অ্যারেভার মধ্যে প্রি-ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ (অ্যারেভা, অ্যাস্টম এবং এনপিসিআইএল) তাদের লগ্নীকৃত অর্থ ঝুঁকির হাত থেকে যথাসম্ভব বাঁচাতে পারে। এই চুক্তিগুলি অসামরিক পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত হলেও, যে প্রযুক্তি হস্তান্তরিত হচ্ছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও তার বহুল ব্যবহার হতে পারে। সেইসঙ্গে এই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানকেও আরও জোরদার করে তুলতে পারবে।

দুই দেশের এই দুই শীর্ষ নেতা মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত-ফ্রান্স 'মেঘা ট্রপিকস' উপগ্রহ

থেকে তথ্য আদান-প্রদানের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানোর জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) এবং ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পেশ স্টাডিজ-এর মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২০১১ সালে ভারতীয় উৎক্ষেপণ যান পিএসএলভি থেকে এই উপগ্রহটির উৎক্ষেপণ হয়। এছাড়াও, স্যাটেলাইট রিমোট সেনস্নিং, উপগ্রহভিত্তিক যোগাযোগ ও উপগ্রহভিত্তিক আবহবিজ্ঞান ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য দু'দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার মধ্যে আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রাফালে যুদ্ধ বিমান সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তিটিই এই সফরে স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা চুক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সরাসরি দুই সরকারের মধ্যে এই চুক্তিতে ফ্রান্স ভারতকে 'যথা শীঘ্র সম্ভব' ৩৬টি রাফালে যুদ্ধ বিমান একেবারে উড়ানের উপযোগী অবস্থায় সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে। ভারতের বায়ুসেনাবাহিনী ১২৬টি বহুমুখী বিমানের প্রয়োজনীয়তা বুঝে দীর্ঘদিন আগেই 'রাফালে' বিমানের নাম সুপারিশ করেছিল। তখন ঠিক হয়েছিল যে প্রাথমিকভাবে ১৮টি বিমান আমদানির পর হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল) বাকি বিমানগুলি তৈরি করবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ফরাসি সংস্থাটি হ্যাল-এর পরিবেশ দেখে সন্তুষ্ট হয়নি এবং হ্যাল-এর কারখানায় নির্মিত বিমানের গ্যারান্টি দিতেও রাজি হয়নি। ফলে এই বিমান সরবরাহ চুক্তিটি এক জটে আটকা পড়ে যায়। দেখা দেয় অচলাবস্থা। ইতিমধ্যে ভারতীয় বায়ুসেনাবাহিনীতে যুদ্ধবিমানের সংকট অনুভূত হয়। ভারতীয় বায়ুসেনাবাহিনী আগে যে মানের (কনফিগারেশন) বিমান পরীক্ষা করে আমদানির অনুমোদন দিয়েছিল এবার চুক্তি অনুযায়ী ঠিক সেই মানেরই ৩৬টি বিমান সরবরাহ করা হবে এবং আরও বেশি সময়কালের জন্য এই বিমানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে ফ্রান্স। ভারতীয় বায়ুসেনাবাহিনীর প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে এই সময়কাল নির্ধারণ করা হবে। বাকি বিমানগুলির ব্যাপারে সরকার পরবর্তীকালে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এক্ষেত্রে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বা ভারতে উৎপাদনের শর্তে আন্তর্জাতিক বিক্রেতাদের কাছে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে উৎপাদনের বরাত দেওয়া যেতে পারে।

ভারত-রাশিয়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

গত পাঁচ দশক ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েতের ভাঙনের রাশিয়াই ভারতকে সবচেয়ে বেশি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করে আসছে। ভারত ও রাশিয়ার মৈত্রী সময়ের বহু কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে এই দুই দেশের সহযোগিতা সবসময়ই তাৎপর্যপূর্ণ। রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিন গত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৪-তে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে নয়া দিল্লিতে আসেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কার্যভার গ্রহণের পর এটিই ছিল রুশ প্রেসিডেন্টের প্রথম ভারত সফর। এই শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার নির্মিত বিমানবাহী জাহাজ আইএনএস বিক্রমাদিত্যকে দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক সহযোগিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এও বলেন যে ভারতের সামনে এখন বিকল্প অনেক পথ খুলে গেলেও প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে রাশিয়া সব সময়ই ভারতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী থাকবে। এই কথা বলে তিনি দুই দেশের দীর্ঘমেয়াদি সামরিক সম্পর্কেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানের অঙ্গ হিসাবে রুশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতে যৌথভাবে Mil Mi-১৭ এবং Kamov Ka-২২৬ হেলিকপ্টার নির্মাণের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে দুপক্ষ। সেইসঙ্গে, যৌথ উদ্যোগে লাইট ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্র্যাফটের নকশা তৈরি ও তা নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত প্রকল্প দীর্ঘদিন ঝুলে ছিল সেগুলিও দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে দু'পক্ষের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে, সুখোই ও হ্যাল-এর যৌথ উদ্যোগে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান নির্মাণের ব্যাপারেও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত চুক্তি খুব শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইএনএস চক্রের পরে রাশিয়া ভারতকে আরও একটি 'আকুলা' শ্রেণির পরমাণু শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ ইজারা দিতে সম্মত হয়েছে। প্রসঙ্গত, আইএনএস চক্র ইতিমধ্যেই সামরিকবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেছে।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে পাকিস্তান ও রাশিয়ার সহযোগিতা, বিশেষত, রাশিয়ার তরফে পাকিস্তানকে Mi-৩৫ আক্রমণকারী হেলিকপ্টার বিক্রয়কে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে সমস্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়ে ভারত কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েছে। তবে ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত এ ব্যাপারে ভারতকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোনও পদক্ষেপ রাশিয়া নেবে না। পরে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট পুটিন নিজেই জানিয়েছেন যে, 'রাশিয়া ও পাকিস্তানের যোগাযোগ দীর্ঘমেয়াদে ভারতের উপকারই করবে।'

ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

আলোচ্য বছরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়াও আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা-সহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে একটি দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা সহযোগিতা কাঠামো চূড়ান্ত করেছে। নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগের প্রতিফলন ঘটাতে নিরাপত্তা সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি কাঠামো গড়ে তুলতে সম্মত হয়েছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবট। পরস্পরের স্বার্থজড়িত এমন ক্ষেত্রগুলিতে দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা আরও গভীর করে তুলতেই এই কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ। অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে পারস্পরিক এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে সামুদ্রিক নিরাপত্তার ওপরই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হবে। তিনি বলেছেন, 'সামুদ্রিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে আমরা পরস্পরের সঙ্গে আরও বেশি করে সহযোগিতা করব। সামুদ্রিক নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা একযোগে কাজ করব এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলিতে আমরা একে

অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করব এবং আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্বজনীন বিধির প্রতি যাতে বিশ্বের দেশগুলি শ্রদ্ধাশীল থাকে তা নিশ্চিত করতেও আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'

এর আগে মায়ানমারে পূর্ব এশিয়া এবং আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন এটি তারই পুনরাবৃত্তি। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীরা এই বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা স্থির করেন। এই কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, একটি করে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত মতবিনিময় ও সমন্বয়সাধনের কাজ চলবে। এই পরিকল্পনায় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বার্ষিক বৈঠকের কথা রয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক মঞ্চগুলির বৈঠকের ফাঁকে দু'জনের একান্ত বৈঠকের আয়োজনও থাকতে পারে। এছাড়াও, এই কর্মপরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে নিয়মিত প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক আয়োজন ও প্রতিরক্ষা নীতি বিষয়ক বার্ষিক আলোচনার পাশাপাশি দুই দেশের সামরিকবাহিনীর মধ্যে সংযোগসাধনের কথা রয়েছে। সামরিকবাহিনীর উচ্চস্তরের প্রতিনিধিদের নিয়মিত সফর, সামরিক কর্তাদের মধ্যে বার্ষিক বৈঠক, যৌথ প্রশিক্ষণ, নিয়মিত মহড়া তথা নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক মহড়ার মাধ্যমে এই সংযোগ গড়ে উঠবে। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিশেষজ্ঞদের নিয়মিত সফরের মাধ্যমে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের সম্ভাব্য দিকগুলিকে চিহ্নিত করা এবং দুই দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কথাও বলা হয়েছে এই কর্মপরিকল্পনায়।

সবচেয়ে বড় কথা, সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবিলায় একটি যৌথ কর্মীগোষ্ঠীর বার্ষিক বৈঠক, সন্ত্রাসবাদ দমন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইজ (আইইডি) ও বোমা বিস্ফোরণের বিভিন্ন ঘটনা তথা এ সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে দু'পক্ষের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিনিময়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই কর্মপরিকল্পনায়। বিদেশমন্ত্রীদের নির্দিষ্ট কাঠামোভিত্তিক বৈঠক এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক ইত্যাদির মতো প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়মিত খতিয়ে দেখা হবে।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা

আলোচ্য বছরে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়াও পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করতে সম্মত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দক্ষিণ কোরিয়া সফরের সময় প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে যে দশটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সাতটিই প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্পর্কিত। এর মধ্যে প্রধান হল দুই দেশের মধ্যে জাহাজ নির্মাণ কারখানা ও নৌবহর বিনিময়। এই সহযোগিতার অঙ্গ হিসাবে প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়ায় জাহাজ নির্মাণ কারখানায় ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় ভারতেরই জাহাজ নির্মাণ কারখানায় এই ধরনের জাহাজ নির্মাণের কথা হয়েছে।

অনুরূপভাবে আলোচ্য বছরে, পরমাণু শক্তি, মহাকাশ গবেষণা ও প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ভারত ও কানাডার বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বেশ কিছু বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই ধরনের একটি চুক্তি অনুযায়ী সাসকাচুয়ানভিত্তিক সংস্থা 'ক্যামিকো' আগামী পাঁচ বছরে ভারতকে সাত মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে। ভারত সরকারের তরফে কানাডা-ভারত পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

গত এক বছরে মরিশাসের সঙ্গেও ভারতের প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এমনিতেই এই দেশটির সঙ্গে ভারতের সামরিক যোগাযোগ বহুদিনের। 'অপ্রবাসী দিবস' উপলক্ষে গত ২ নভেম্বর, ২০১৪-তে, এই দ্বীপরাষ্ট্রটিতে তাঁর প্রথম সফরে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ভারত মহাসাগরের কৌশলগত দিক থেকে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ভারতীয় নৌবাহিনী ও মরিশাসের উপকূল রক্ষী বাহিনীর সহযোগিতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সমারোহ চলাকালীন ভারতের যে প্রধান তিনটি যুদ্ধ জাহাজ মরিশাসের জলসীমায় নোঙর করা ছিল তা ভারতীয় নৌবাহিনী ও মরিশাসের উপকূল রক্ষী বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতার বার্তা-ই তুলে ধরেছে।

এ প্রসঙ্গে, ইজরায়েলের কথাও অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে এই দেশটির সঙ্গেও ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সন্ত্রাসবাদ দমনে দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। এছাড়াও, ইজরায়েল ভারতকে ক্ষেপণাস্ত্র ও মানববিহীন বিমান (আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল)-সহ অত্যাধুনিক সামরিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে আসছে। গত এক বছরে দুই দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রটি আরও প্রসারিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আগামী বছরের মধ্যে ইজরায়েল সফরে যাবেন।

পরিশেষে

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিকমহল ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মাথায় রেখেই এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে ভারতের সামরিক শক্তির ওপর আস্থাও তাদের বাড়ছে। নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরেও বিভিন্ন দেশ এখন ভারতের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। আগামী দিনে এই সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে আশা করা যায়। আর তাহলে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে আসবে নতুন জোয়ার যা দেশের চালচিত্রটাকেও হয়তো একদিন বদলে দেবে।❑

(তথ্য সহযোগিতায় বর্মা গুপ্তা)

[লেখক সেন্টার ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন-এর নির্দেশক।

email : alokbansal_nda@yahoo.co.in]

সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মোদী সরকারের বিদেশ নীতি

বিশ্বের দরবারে নিজেদের অবস্থান পাকা-পোক্ত এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা ভারতের সব সময়ই ছিল। বিভিন্ন সরকার নিজেদের নীতি অনুসারে সে চেষ্টা করেছে এবং নানা ধরনের বাধা ও সমস্যার সম্মুখীনও হতে হয়েছে তাদের। তাই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার আশ্বাসের বার্তা নিয়ে বিগত এক বছরে প্রধানমন্ত্রীর ঘন ঘন বিদেশ সফর; নতুন কিছু নয় তবে এ বিষয়ে তাঁর তৎপরতা ও উৎসাহ অবশ্যই চোখে পড়ার মতো। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এর সুফলও আমরা পাব। লিখছেন **অনিন্দ্য জ্যোতি মজুমদার।**

একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অনেকটাই পালটে গেছে; যে প্রবণতার শুরু ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগাবসান থেকে। ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দুই মহাশক্তির দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ক্ষমতার লড়াই শেষ হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আধিপত্যে। বিশ্বায়নের চাপে বদলাতে থাকে রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক; অর্থনৈতিক বোঝাপড়া রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের থেকে জরুরি মনে হতে থাকে। নিরাপত্তার ধারণাও যায় বদলে। দেশে দেশে যুদ্ধের সম্ভাবনার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের সমস্যা, জাতি বিদ্বেষ, জলবায়ু পরিবর্তন বা পরিবেশ দূষণের মতো বিষয়গুলি। পরিবর্তনশীল আর সম্ভাবনাময় এই নয়া জমানার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে রাষ্ট্রগুলির বিদেশ নীতিতেই পরিবর্তন আনতে হয়েছে, ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন এক নতুন শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে; দক্ষিণ এশিয়া, ভারত মহাসাগরে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ক্ষমতার সমীকরণে এক নতুন দিক। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক যেমন আজ অনেক গভীর, ভারতের কূটনৈতিক কৌশলেও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অংশীদারি একটা পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছে।

সময়ের পরিবর্তনে আর পরিস্থিতি অনুসারে বিদেশ নীতির আঙ্গিকে খানিকটা বদল এলেও জাতীয় স্বার্থের মূল দু-একটি উপাদান কখনওই বদলায় না। অস্তিত্বই যাতে বিপদের মুখে না পড়ে তার জন্য চাই সব ধরনের নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজন আর্থিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতের বিদেশ নীতি আর্থিক উন্নয়নের বিভিন্ন পথ খুঁজে এসেছে। রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণা ছেড়ে সংস্কারের পথ নিয়েছে। ভারতের বিদেশ নীতির এই অভিমুখ গত শতকের শেষ দশকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সমসাময়িক বিদেশ নীতিও সেই ধারাকে অনুসরণ করে।

সমৃদ্ধি এবং আর্থিক উন্নয়ন মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালে তা বাস্তবায়িত করতে চাই ধারাবাহিক কর্মসূচি। দীর্ঘকালীন মেয়াদে তার ব্যাপ্তি, উন্নয়ন রাতারাতি সম্ভব হয় না। কাজেই সরকারের পরিবর্তন হলেই বিদেশ নীতি পালটে যায় না। মূল ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই দেশ এগিয়ে চলে, শুধু পরিস্থিতি আর পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বিদেশ নীতির উপধারাগুলি জন্ম নেয়। এর ফলে এক-একটা সময়ে এক-একটা ইস্যু বা অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বৈদেশিক সম্পর্কের পারদ ওঠে-নামে।

দেশকে দ্রুত আর্থিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মোদী সরকারেরও ঘোষিত লক্ষ্য। আর্থিক সমৃদ্ধি যেমন একদিকে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়ক, তেমনই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় প্রভাব বাড়াতেও তা প্রয়োজন। এই ভাবনা থেকেই নতুন উদ্যমে বিদেশ থেকে পুঁজি ও প্রযুক্তি এনে ভারতের জনবলকে কাজে লাগিয়ে একটা কর্মকাণ্ডের জোয়ার তৈরি করার চেষ্টা হয়ে চলেছে, যা সফল হলে ভারত এক ধাপে অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

কোনও ব্যাঘাত ছাড়াই আর্থিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যপূরণ করতে হলে ভারতের প্রয়োজন এক শান্তির স্থিতিশীল পরিবেশ এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুস্থ, সহজ সহযোগিতার সম্পর্ক—সে প্রতিবেশী হোক বা দূরবর্তী কোনও দেশ। সুতরাং সংঘাতের পরিবেশ, ক্ষমতার লড়াই অথবা কোনও শক্তি জোটে জড়িয়ে পড়তে ভারত চাইবে না। নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস না করেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতার সেতুবন্ধন ভারতের কাম্য হবে।

এই বিশাল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য কিছু অন্যান্য বিষয়কেও জরুরি করে তোলে এবং বিদেশ নীতিও সেই ভাবনা-চিন্তায় প্রভাবিত হয়। যেমন সুনিশ্চিত জ্বালানি সরবরাহ না থাকলে বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্ভব না। সুতরাং প্রথাগত জ্বালানি, তেল বা গ্যাস আমদানির সঙ্গে সঙ্গে জোর দিতে হবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনেও। সেই

অনুসারে বিদেশ নীতিকেও তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতার কারণে, জোরদার নেতৃত্বের অভাবে, নানা দুর্নীতির অভিযোগ এবং নীতি পঙ্গুত্বে ভারতের অগ্রগতির ধারা সময়ে সময়ে থমকে গেছে। এমন এক প্রেক্ষিতেই নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসে। প্রথম বছরের নিরিখে এটা স্পষ্ট যে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের সমসাময়িক বিদেশ নীতির মূল কাণ্ডারি এবং বিদেশ নীতিকে তিনি জাতীয় স্বার্থপূরণের অন্যতম উপায় বলেই মনে করছেন।

দুই

আন্তর্জাতিক সমস্যা সাধারণত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় না, দুটি দেশের মধ্যে স্বার্থজনিত বোঝাপড়াও ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু দেশীয় নীতি নির্ধারণে এবং রাজনীতিতে ব্যক্তি বিশেষের যথেষ্ট প্রভাব থাকতে পারে। তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিদেশ নীতির ওপর গিয়ে পড়ে। কাজেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চড়াই-উতরাইয়ে রাষ্ট্রনেতা বা সরকারের প্রধান যিনি, তাঁর একটা ভূমিকা থেকেই যায়। এই ভূমিকা সবসময়ই সদর্থক হবে তা নয়, তবে কতটা কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে মূলত চারটি বিষয়ের উপর।

(১) তিনি নিজে বিদেশ নীতিকে কতটা প্রাধান্য দেন এবং সে বিষয়ে তাঁর সক্রিয় উৎসাহ আছে কি না;

(২) বিদেশ নীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার মতো স্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি আছে কি না;

(৩) তাঁর বিদেশ নীতির মুখ্য ধারার পেছনে দলীয় সমর্থন কতটা বা সরকারে তাঁর নিজের প্রাধান্য কতখানি; এবং

(৪) দেশীয় রাজনীতি বা অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি তাঁকে বিদেশ নীতির দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়ার মতো সময় আর সুযোগ দিচ্ছে কি না।

এই চারটি দিক বিশ্লেষণ করে বিদেশ নীতির উপর ব্যক্তি বিশেষের প্রভাবের পরিধির একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ক্ষেত্রেও এই বিশ্লেষণ একইভাবে প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে নরেন্দ্র মোদী বিদেশ নীতি এবং দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী, সক্রিয় এবং তাঁর আমলে, বিশেষত প্রথম বছরে, বিদেশ নীতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের সময় সার্ক-গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ এবং তার পরে পরেই ১২ মাসে ১৮টি বিদেশ সফর, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রভাবশালী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেবার প্রয়াস একদিকে যেমন নরেন্দ্র মোদীকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় এক পরিচিত মুখ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে অন্যদিকে মোদীর সঙ্গে সঙ্গে মোদীর আমলের ভারতকে জানবার উৎসাহও আন্তর্জাতিক স্তরে তৈরি হয়েছে।

সমসাময়িক ভারতের জাতীয় স্বার্থ হিসেবে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কথা আগেই বলা হয়েছে যা বর্তমান দুনিয়ায় অন্যদের থেকে দূরে সরে একার ক্ষমতায় সম্ভব নয়। পুঁজি, প্রযুক্তির ঢালাও আমদানি এবং ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত এখন বিদেশ নীতির এক মুখ্য উপাদান। খুবই স্বাভাবিক এই প্রবণতা বেশ কিছু বছর ধরেই ভারতের বিদেশ নীতিতে স্পষ্ট। নরেন্দ্র মোদী অবশ্যই একই পথে এগিয়েছেন, বিগত সরকারের অনুসৃত মূল নীতিগুলির ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের 'লুক ইস্ট' নীতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, নাম পালটে এখন তা 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি হয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। পুঁজি-প্রযুক্তির আমদানির নীতিও ১৯৯০-এর দশকের সংস্কারের পর থেকে থমকে থমকে এগিয়ে চলেছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমলে তা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নাম পেয়েছে। দীর্ঘ এক বছর নতুন ভারতের গ্রহণযোগ্যতা নরেন্দ্র মোদী দুনিয়ার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, অনেকটা এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়িকের মতো, যাতে প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যবসা আর পুঁজি ভারতকে আরও পছন্দসই গন্তব্য বলে মনে করে। সুতরাং এর সঙ্গে সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষতার বৃদ্ধি এবং প্রসার, ঘরোয়া সংস্কারের মতো বিষয়গুলিও জড়িয়ে আছে।

একইভাবে, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের ঠান্ডা-লড়াই পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থানও বিশেষ পালটায়নি। শক্তি জোটের হাতছানি উপেক্ষা করে বরং বিরোধী পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করে এসেছে ভারত। এককালে যা জোট নিরপেক্ষ নীতি ছিল, ঠান্ডা লড়াইয়ের পর তা বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে পালটে গিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী এই মূল ধারাগুলিকেই আরও জোরালো প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

নতুন উদ্যমে ভারতকে প্রচারের আলোয় আনতে মোদীকে সাহায্য করেছে তাঁর দেশীয় রাজনৈতিক গুরুত্ব। নির্বাচনের আগেই দলীয় রাজনীতির মঞ্চে তাঁর প্রাধান্য, নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন, সংসদে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। বিরোধী রাজনীতি প্রথম বছরে ততটা দানা বাঁধতে পারেনি (যদিও কোথাও কোথাও দলের হার হয়েছে), অথবা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও এমন বিগড়োয়নি (নানান সমস্যার সুরাহা যদিও দূর অস্ত), যে নরেন্দ্র মোদীকে বিদেশ নীতির থেকে নজর সরিয়ে দেশীয় রাজনীতিতেই সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে। মূল বক্তব্য এখানে এই যে দলীয় সমর্থন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকার কারণে নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় বিদেশ নীতির আঙ্গিনায় এক উৎসাহের জোয়ার আনতে পেরেছেন যা বিগত দিনগুলিতে একটু স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এহেন পরিস্থিতি আগামী দিনেও বজায় থাকবে কি না তা বিতর্ক সাপেক্ষ।

কূটনীতিতে শরীরী ভাষা অনেক সময়ই নানা বার্তা দিয়ে থাকে। নরেন্দ্র মোদী প্রথাগত সরকারি আনুষ্ঠানিক কূটনীতির বাইরে গিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একটা ব্যক্তিগত উষ্ণতার ছাপ রাখার পক্ষপাতী। ছক ভাঙা কর্মসূচি এবং সাদর আলিঙ্গন নিছক সৌজন্যকে অতিক্রম করে সম্পর্কের গভীরতার বার্তা দেয়। এর মধ্যে নাটকীয়তা আছে, বাহারি চটক কখনও কখনও মূল বিষয়কে ছাপিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একবিংশ শতকের অনেক রাষ্ট্রনায়কই বিংশ শতকের কূটনৈতিক রীতিনীতির গতানুগতিক পথে চলেন না এবং

প্রধানমন্ত্রী মোদীও তার ব্যতিক্রম নন। বলা চলে, একবিংশ শতকে শীর্ষ কূটনীতির প্রবণতা বেড়েছে, রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নরেন্দ্র মোদীর আচরণশৈলীও খাপ খেয়ে গেছে।

ভারতে যে প্রধানমন্ত্রীরা একটু দীর্ঘ সময় ধরে পদে আসীন ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিদেশ নীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। স্বল্প সময়ের প্রধানমন্ত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই বিদেশ নীতিতে তেমন কোনও ছাপ রেখে যেতে পারেননি, যদিও ইন্দ্র কুমার গুজরাল এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে ভারতকে কৌশলগত অবস্থান নিতে হয়েছে, সেখানে জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষাপটই বড় হয়ে উঠেছে, তা ভুল হোক বা সঠিক। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ব্যক্তিকে ছাপিয়ে রাষ্ট্রই বড়, তাই জাতীয় স্বার্থের আঙ্গিকে এবং প্রেক্ষিতেই নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ নীতির মূল প্রবণতার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন জরুরি।

তিন

সাধারণভাবে বলা হয় ভারতের বিদেশ নীতিতে সচরাচর নয়া উদ্যোগ দেখা যায় না। বরং কোনও নতুন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে হয় আমরা সাড়া দিই বা দিই না, বা কোনও আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি মাত্র। মূল কতকগুলি বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই আমাদের বিদেশ নীতি অগ্রসর হয়। নেহরুর আমলের জোট নিরপেক্ষতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ঠান্ডা লড়াইয়ের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। তাকে অতিক্রম করে অন্য কোনও উদ্যোগ কখনও নেওয়া হয়নি। বাস্তবিক, ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করতে স্বল্পপ্রভাবী 'গুজরাল ডকট্রিন' বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য 'লুক ইস্ট' নীতি ছাড়া তেমন কোনও সুদূরপ্রসারী বিদেশ নীতির সুসংবদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় না। পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশ্যই বিদেশ নীতিতে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন অনেক সময়ই এসেছে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশ নীতি বাঁক নিয়েছে, কোনও পূর্বপরিকল্পিত দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নয়।

এহেন পরিস্থিতিতে, যেখানে শান্তি, সহাবস্থান, মৈত্রী, সহযোগিতা ইত্যাদি কিছু নৈতিক মূল্যবোধের বাইরে খুব স্পষ্ট করে বিদেশ নীতি ব্যাখ্যা করতে সরকারি স্তরে অনীহা দেখা যায়; সেখানে নয়া উদ্যোগ সব সময়ই একটা চমকের সৃষ্টি করে। সার্কগোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের মোদীর শপথ গ্রহণের সময় আমন্ত্রণ জানানো এমনই এক চমকের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাকে প্রথাগত রীতিনীতির বাইরে এক নতুন অধ্যায় শুরুর প্রচেষ্টা বলে ভাবতেও বাধা নেই।

বাস্তবে ভারতকে যদি দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে বেরোতে হয়, যদি উদীয়মান শক্তির তকমা ধরে রাখতে হয় এবং এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পরিচিতি পেতে হয়, তবে অনেকগুলি ক্ষেত্রে একই সঙ্গে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা বর্তমান। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে চীন ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে প্রভাব বিস্তারে তৎপর। তা চীনের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেমন স্বাভাবিক, তেমনই ছোট রাষ্ট্রগুলির পক্ষেও চীনের আর্থিক সহযোগিতা ও সাহায্যের সুযোগ নেওয়া স্বাভাবিক। প্রতিবেশী দেশগুলি যাতে এই প্রক্রিয়ায় একেবারেই চীনের তাঁবে চলে না যায় সেদিকে যেমন ভারতকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। একইভাবে পারস্পরিক সংযোগ বৃদ্ধি পেলে তা ভারত-সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও লাভজনক।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও চীন যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠছে। সামুদ্রিক রেশম পথের ধারণা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনের জন্যই নয়, সমুদ্রপথের নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তাও এই ধারণার অংশ। নিরাপত্তা কায়েম করতে গিয়ে সমুদ্রপথের উপর দখলদারি এবং একচ্ছত্র অধিকার স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিলেই তা অন্যান্য দেশের চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। ভারতের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয়, এক সমর্থ নৌবাহিনীর মাধ্যমে সেটাও ভারতকেই নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে যখন আপাতদৃষ্টিতে জলদস্যুতা বন্ধ করার দোহাই দিয়ে ভারত মহাসাগর হয়ে আরবসাগর অঞ্চলে চীনা ডুবোজাহাজের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

চীনের এই প্রভাব বিস্তারের অর্থ প্রকারান্তরে শুধু ভারত বা স্থানীয় অন্যান্য দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টিই নয়, তা মার্কিন আধিপত্যের সংকোচনের সূচনা। সুতরাং এক শক্তিসাম্য গড়ে তোলার এক প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক পরোক্ষে চীনের ভাবনা-চিন্তাকেও প্রভাবিত করবে ধরে নেওয়া যায়।

চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সমস্যা, পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার পিছনে চীনের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ—এ সবই যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। অথচ চীনের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিক সম্পর্কও যথেষ্ট গভীর। অনেকেই মনে করেন যে চীনের উদ্বৃত্ত পুঁজি ভারতে এলে, যৌথভাবে উন্নয়নের কাজ হলে, দু'দেশের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমঝোতা এবং সংযোগ থাকলে দু'পক্ষেরই লাভ। কিন্তু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও চীন অনেক লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। আমরা চীন থেকে আমদানি যতটা করি, রপ্তানি ততটা করতে পারি না। ভারতের চাহিদা এবং চীনের উদ্বৃত্ত উৎপাদন এর জন্য অনেকটাই দায়ী। সুতরাং বাণিজ্যখাতে এক বিশাল ঘাটতি সব সময়ই থেকে যায়, যা চিন্তার বিষয়।

সমস্যা থাকলেও চীনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে অর্থনৈতিক সমঝোতা সুদৃঢ় করার চেষ্টা ভারত করেছে। ব্রিক্স (BRICS) রাষ্ট্রগোষ্ঠীর দেশগুলি—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা—যেমন নিজস্ব গোষ্ঠীভিত্তিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত

করেছে, ব্রিক্‌স ব্যাংক স্থাপন করেছে, একইভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ২০১৪ সালে যখন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারতে আসেন তখনই ঠিক হয় যে পরবর্তী ৫ বছরে চীন ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পুঁজি ভারতে আনবে। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীর চীন সফরের সময় একইভাবে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের অনেকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই দুই সফরেই বাহ্যিক উষ্ণতার কোনও অভাব ছিল না, কিন্তু বাস্তবে অগ্রগতি কতটা সম্ভবপর, তা সময়ই বলবে। কেননা চীন-ভারত সম্পর্ক অনেকটাই চলে নরমে-গরমে। পাক-অধিকৃত অঞ্চলে ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ করে চীন যে 'ইকনমিক করিডোর' তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে ভারত আপত্তি জানিয়েছে। আবার ভিয়েতনামের সঙ্গে যৌথভাবে দক্ষিণ চীন সাগরে ভারতের তেল খোঁজার প্রচেষ্টায় আপত্তি করেছে চীন। মনে করা যায়, আসন্ন দিনগুলিতে এইভাবে চলতে চলতে নিপুণ কূটনৈতিক ভারসাম্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার সহাবস্থানে বেঁধে রাখা যাবে, না হলে সম্পর্কে সংকট দেখা দেবে এবং সেক্ষেত্রে কিছু সমমনোভাবাপন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা জরুরি।

ভারতীয় জনতা পার্টি মোদী সরকারের বিদেশ নীতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'পঞ্চামৃত' ধারণার জন্ম দিয়েছে। এই 'পঞ্চামৃত' ধারণার মূল স্তম্ভগুলি হল সম্মান, সংবাদ (বা আলাপ-আলোচনা), সমৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংযোগ। স্পষ্টতই, কয়েকটি বিমূর্ত ধারণার বাইরে 'পঞ্চামৃত' কোনওরকম পথনির্দেশ করে না, বিদেশ নীতি সব সময়ই এই লক্ষ্যগুলিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তুলনায় 'পঞ্চশীল' নীতি ছিল কয়েকটি সুস্পষ্ট নীতির সমাহার। সুতরাং 'পঞ্চশীল'-এর ধারণা যতটা প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল, 'পঞ্চামৃত'-র ধারণা সেই অর্থে মোটেই জনপ্রিয় হয়নি।

অনেকেই মনে করেন নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ নীতি ঘোর বাস্তবধর্মী এবং প্রায়োগিক, নীতি বা তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে তাকে ধরা মুশকিল। বহু দিন থেকেই যে লক্ষ্যগুলি ভারতের কাঙ্ক্ষিত; অথচ বাস্তবায়িত হচ্ছিল না, নরেন্দ্র মোদী নতুন উদ্যমে সেই লক্ষ্যপূরণে আগ্রহী। এই অর্থে তিনি বাজপেয়ি সরকার বা মনমোহন সিংহ সরকারের প্রকৃত উত্তরসূরি।* আপাতদৃষ্টিতে এটাই মনে হওয়া সম্ভব যে ভারতের মানুষের অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানোর যে স্বপ্ন প্রাক্-নির্বাচন পর্যায়ে নরেন্দ্র মোদী দেখাতে পেরেছিলেন, তাঁর বিদেশ নীতিও সেই অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের অনুসারী। সুতরাং মোদী সরকারের বিদেশ নীতির মধ্যেও পূর্বসূরিদের অনুসৃত ধারা প্রবহমান।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রক্ষণশীল আমলাতন্ত্র এবং বিরোধী রাজনীতির ভিড় ঠেলে পড়ে থাকা কাজ দ্রুত মিটিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা মোদী সরকারের বিদেশ নীতিতে আছে। পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা সমঝোতা, জাপান থেকে পুঁজি নিবেশের আশ্বাস, জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের গ্রহণযোগ্যতাকে তুলে ধরার নিরন্তর প্রয়াস এই প্রবণতার প্রতিফলন। বিদেশ নীতি আগামী দিনেও যে মোদী সরকারের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাবে তার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রীর ভাবী সফরসূচি যা প্রথম বছরের মতোই নানা কর্মকাণ্ডে ঠাসা।

বিশ্বায়ন এবং পরস্পর-সংযুক্ত আজকের দুনিয়ায় দেশের ভাবমূর্তির বিপণন জরুরি। নরেন্দ্র মোদীর সফরে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেছে যা বিদেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে ভারতের পক্ষে প্রভাব বিস্তারে কাজ করতে পারে। বিপণনের অঙ্গ হিসেবেই চায় পে চর্চা-র মতো প্রতীকীবাদ নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ নীতির বৈশিষ্ট্য, যা একাধারে দৃষ্টি আকর্ষণীয় এবং নাটকীয়। এবং বাছাই করা কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে শুধু নয়, মঙ্গোলিয়া, মরিশাস বা সেশেল্‌স এবং আগামী দিনে প্রস্তাবিত ইস্রায়েল-প্যালেস্তিন সফরের ভাবনা, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের উপস্থিতি এবং সম্পর্কের বার্তা দেয়। 'মোদী ডকট্রিন' বলে সত্যিই কিছু আছে কি না, তা তর্ক সাপেক্ষ; কিন্তু 'ব্র্যান্ড মোদী', যার ধরন-ধারণ পূর্বসূরিদের থেকে অনেকটাই অন্যরকম, তা অস্বীকার করা যায় না।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি চিরকালই ধোঁয়াশায় ভরা। এর মধ্যে জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে হলে যেসব বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে হয় তার ফলাফল সব সময় প্রাথমিক প্রত্যাশা বা পূর্বাভাস অনুযায়ী নাও হতে পারে। পরিস্থিতি, ঘরোয়া অথবা আন্তর্জাতিক, পালটে যেতে পারে। মোদী সরকারের সাফল্য-অসাফল্যের খতিয়ান বিচারের জন্য তাই আরও সময় দিতে হবে। রাষ্ট্রের সম্মান এবং প্রভাব নির্ভর করে তার আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সামরিক ক্ষমতার উপর। মোদী সরকারের আমলে এই দুটি ক্ষেত্রে যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে তা বিদেশ নীতির প্রাথমিক শর্ত পূরণ করে।❑

[লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক।]

*Ian Hall, "Is a Modi Doctrine energiag in India's foreign policy?", Australian Journal of International affairs, 69(3).247-252; http://dx.doi.org./10.1080/10357718.2014.1000263 Accessed 04.06.2015

ভারত-চীন সম্পর্ক : রূপান্তরিত বন্ধন

জনসংখ্যার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে পৃথিবীর বৃহত্তম দুটি দেশই এশীয়—প্রথম চীন, দ্বিতীয় ভারত। প্রতিবেশী এই দুই দেশের মধ্যে রেষারেষির শেষ নেই—এমনকী যুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছে। আজ তারা ফের একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কিন্তু রণক্ষেত্রে নয়, কূটনীতির ময়দানে আলাপ-আলোচনা করতে। ভারত-চীন সম্পর্কে আসা এই নতুন মোড়ের দিকে আলোপকপাত করছেন **মণীশ চাঁদ।**

ভারত-চীন সম্পর্কের ইতিহাসে এক রূপান্তরের মুহূর্ত সমাগত। দুই প্রতিবেশী দেশ যেভাবে নতুন শক্তি, গতিশীলতা আর সৃজনশীলতা নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কের বিকাশে মনোনিবেশ করেছে তা থেকেই একথা বোঝা যাচ্ছে। এই প্রথম এশিয়ার এই দুই বৃহৎ শক্তির নেতৃবৃন্দ মাত্র ন মাসের মধ্যে একে অপরের দেশ সফর করলেন। এই বার্তা দিতে যে এশিয়ার শতক হিসেবে বর্তমান শতাব্দীকে প্রতিষ্ঠিত করতে উভয়েই সক্রিয় সহযোগিতার পথ বেছে নিতে প্রস্তুত। চীনের তিন নগর সিয়ান, বেজিং ও সাংহাই-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১৪-১৬ মে-র সফর নানা দিক থেকেই নজিরবিহীন আর এশিয়ার দুই বৃহদাকার রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক ঐক্যের বার্তাবাহী যে দুই রাষ্ট্রের সম্মিলিত জনসংখ্যা বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ লোকসংখ্যার সমান আর সম্মিলিত জিডিপি ১২ ট্রিলিয়ন ডলার।

২০১৪-র সেপ্টেম্বরে চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং-এর প্রথম ভারত সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে গতির সঞ্চার হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর তাকে আরও সংহত করেছে। একত্র করা হলে, এই যুগ্ম সফর আর দিল্লির পূর্বতন সরকারের আমলে গৃহীত পদক্ষেপগুলি চীন-ভারত সম্পর্কের নতুন বর্ণমালাকে পরিস্ফুট করে : যেখানে এ মানে এশিয়া, বি হল বাণিজ্য, সি-তে সংস্কৃতি আর ডি-তে উন্নয়ন আর কূটনীতি বোঝায়। এই নতুন শব্দমালা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন পথ খুলে দেয়, যাদের এশীয় বলয়ে এতদিন প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী বলে ভাবা হত, তারা ক্রমশ এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সর্বব্যাপী সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রেও।

আপন নগরভিত্তিক কূটনীতি

কূটনীতি, সংস্কৃতি, ব্যবসা আর বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক সমীকরণকে একসূত্রে গ্রথিত করে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এবারের চীন সফর প্রতীকী দিক থেকে তো বটেই আর বাস্তবিক পরিণামের দৃষ্টিকোণ থেকেও যথেষ্ট উঁচুমানের স্বাক্ষর রেখেছে যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রূপান্তরমুখী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যঞ্জনা আর প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁর পরিবারের আপন শহর শান সি প্রদেশের রাজধানী সিয়ান-এর এক রাজকীয় অতিথিশালায় সমাদর করেছেন যা কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রনেতার পক্ষে এই প্রথম। উষ্ণতা আনয়নকারী বৈঠকে রাষ্ট্রপতি শি চীন-ভারত সম্পর্কের এক সুদৃঢ় প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বলেছেন চীন-ভারত মৈত্রী 'স্থিতিশীল বিকাশের পথ ধরে প্রসারণশীল সম্ভাবনার দিকে অগ্রসরমান'।

টেরাকোটা যোদ্ধাদের সংগ্রহশালা আর সংস্কৃত পুঁথি থেকে অনূদিত সম্পদ যে বৌদ্ধ মন্দিরে রক্ষিত সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর পদার্পণ দু'দেশের সুপ্রাচীন সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই প্রথম চীনা রাষ্ট্রপতি তাঁর পিতৃপুরুষের নিজভূমে কোনও বিদেশি রাষ্ট্রনেতাকে আপ্যায়িত করলেন চীন-ভারত সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে। রাষ্ট্রপতি শি ব্যক্তিগত আতিথেয়তা আর উষ্ণতার যে নিদর্শন রেখেছেন তা যেন তাঁর প্রতি আমেদাবাদে প্রধানমন্ত্রী মোদী-র উষ্ণ অভ্যর্থনারই প্রতিরূপ। এই প্রথম চীন ও ভারতের রাষ্ট্রনায়করা একে অপরের দেশ সফর শুরু করলেন সে দেশের রাজধানী হয়ে নয়, কোনও রাজ্য বা প্রদেশের রাজধানী থেকে। ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রাবাহী এ এক আপন নগরভিত্তিক কূটনীতি। এ যেন প্রথাবদ্ধ কূটনৈতিক শিষ্টাচারের গণ্ডি ছাড়িয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে হৃদয় ও মনের সংযোগবাহী দীর্ঘস্থায়ী ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করা। সিয়ান-এ অপেক্ষমাণ জনতার উদ্বেল অভ্যর্থনায় আপ্লুত শ্রী মোদী টুইট করেছিলেন এই বলে, 'চীনের জনসাধারণের বিপুল উৎসাহে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মানুষে মানুষে বন্ধন সব সময়েই বিশেষ মাত্রাবাহী।'

বৃহৎ শক্তির নতুন কাহিনি : এশিয়ার শতক

কূটনীতিতে দেখানোর একটা গুরুত্ব আছে তবে তা কখনওই মূল বিষয়কে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। ভারত-চীন সম্পর্কে প্রকাশমান সম্পর্কের নতুন কাহিনিও তাই প্রতীক, ব্যঞ্জনা আর বিষয়ের দক্ষ সমন্বয়ে রচিত এবং দু'দেশের ২৬০ কোটি মানুষের জীবনযাত্রা ও ভবিষ্যৎকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে এমন এক দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষাপটের বাঁধনে যা দু'দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৫ মে-র যৌথ বিবৃতিটি যেন এক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক গঠনে রচিত যা ভারত ও চীনকে এতদঞ্চলের এমন দুই প্রধান শক্তিরূপে স্বীকৃতি দিচ্ছে যারা এশিয়ার শতককে উপযুক্ত আকার দেবে এবং একবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চালচিত্র রচনা করবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, 'উভয়

দেশের নেতৃবৃন্দ এতদঞ্চলের ও বিশ্বের দুই প্রধান শক্তিরূপে ভারত ও চীনের পুনরুত্থানের ফলে এশিয়ার শতাব্দী-র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে সে বিষয়ে সহমত হয়েছেন।' 'একবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও সমগ্র বিশ্বে সংজ্ঞা নিরূপণকারী ভূমিকায় ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যে বিশেষ মাত্রা পাবে সে সম্পর্কেই উভয়েই অবগত।' দু'দেশের সম্পর্ককে এক বৃহত্তর বিশ্ব পটে স্থাপন করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে : 'বৃহত্তম দুই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের এই গঠনাত্মক আদর্শ, দুই বৃহত্তম উত্থানশীল অর্থনীতি এবং বিশ্ব স্থাপত্যের দুই প্রধান স্তম্ভের পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন ভিত্তিভূমি বিশেষ।'

লক্ষ্মণরেখা

সম্পর্কের এই অসাধারণ বাঁধুনি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ—ভারত-চীন সম্পর্কের ফলপ্রসূতা এবং এক সুসমঞ্জস এশীয় শতকের সম্ভাবনা তখনই দেখা দেবে যদি উভয়পক্ষ 'একে অপরের উদ্বেগ, স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি পারস্পরিক সম্মান ও সংবেদনশীলতা দেখায়।' এগুলোই হল গুরুত্বপূর্ণ সেই লক্ষ্মণরেখা যেটা দুটি দেশেরই উচিত সযত্নে মেনে চলা যদি তারা বিশ্বমঞ্চে একে অপরের পুনরুত্থানের অংশীদার হতে চায় সমরকৌশলগত আস্থাহীনতা আর দ্বন্দ্বের মনোভাব ছাড়া। মে মাসে চীন সফরকালে শ্রী মোদী চীনা নেতৃবর্গকে এই সব লক্ষ্মণরেখার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, দুটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের বিকাশের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে না পারার কারণ যেসব বিষয় সেগুলি সম্পর্কে নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে। 'আমি চীনের সেই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছি যেসব বিষয়গুলি দুটি দেশের অংশীদারিত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রতি অন্তরায়স্বরূপ', চীনের প্রধানমন্ত্রী লি-র সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতিতে একথা বলেছেন। তিনি যে বেজিং-এ এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে চীনা প্রধানমন্ত্রীর সামনে একথা বলেছেন এটাই বেজিং-এর কিছু কিছু কাজকর্ম ও অভ্যাসের প্রতি নতুন দিল্লির আপত্তির তীব্রতাটা বুঝিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর ও অরুণাচলপ্রদেশের অধিবাসীদের জন্য চীনের স্টেপলড ভিসাদানের ব্যবস্থা, ভারতীয় ভূখণ্ডে বারংবার চীনা সেনার অনুপ্রবেশ এবং কাশ্মীরের বিতর্কিত অঞ্চল দিয়ে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণের প্রস্তাবিত বিষয়টি। ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি দীর্ঘদিন ধরেই পীড়াদায়ক বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে এবং এ দেশের জনমানসে চীনের ভাবমূর্তির প্রতি বিরূপ প্রভাব ফেলেছে আর সেই সঙ্গে বেজিং-এর অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যের প্রতি নতুন দিল্লির সমরকৌশলগত আস্থাহীনতার সঞ্চার করেছে।

অর্থনীতিই আগে দৃষ্টিভঙ্গি

এই সব মতপার্থক্যের কথা খোলাখুলি বললে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিপদ থাকে কিন্তু এখন ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিণত মানসিকতা ও অকপট দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত মিলেছে; কারণ অসম্মতির উৎসে এই সব মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুটি দেশ কিন্তু ইতিবাচক বিষয় এবং উভয়ের পক্ষেই জয়-জয় অংশীদারিত্বের বৃত্তটা প্রসারিত করার অপরিহার্য অর্থনৈতিক সুযোগের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। বিভিন্ন বৈচিত্রমূলক ক্ষেত্রে, পরিকাঠামো থেকে শুরু করে স্মার্ট সিটি ও রেলপথ থেকে সংস্কৃতি, কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশ, মহাকাশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে ২৪টি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যেই তা প্রতিফলিত।

উভয় পক্ষই তাদের কূটনৈতিক আদান-প্রদান বাড়ানোর এবং নিয়মিত শীর্ষবৈঠকের প্রশ্নে একমত হওয়ার পাশাপাশি চেংদু ও চেন্নাই-তে নতুন বাণিজ্য দূতাবাস খোলার বিষয়েও সহমত হয়েছে। এক প্রামাণ্য পদক্ষেপ হিসেবে দুই দেশই এই প্রথম রাজ্য/প্রদেশ স্তরের নেতৃবৃন্দের মঞ্চ গড়েছে যেটা তাদের রাজ্য স্তরের মধ্যে অধিকতর ভাব বিনিময়ের সুযোগ করে দেবে। এই মঞ্চের প্রথম বৈঠকটি হয়েছে বেজিং-এ গত ১৫ মে, ২০১৫। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে বৈঠকে ভারতের পক্ষে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও গুজরাটের আনন্দীবেন পটেল যোগ দিয়েছিলেন। সব থেকে বড় কথা হল, চীন ও ভারতের নেতৃবৃন্দের মে ২০১৫-র শীর্ষ বৈঠক অর্থনীতি আগে শীর্ষক দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেওয়ার দুটি দেশের উপর্যুপরি সরকারের মধ্যে নতুন যে সম্পর্ক তৈরি হয়ে আসছিল, এটি তার নতুন মাত্রা হিসাবে যুক্ত হয়েছে। সঠিকভাবে বলতে গেলে, আগামী দিনে ও পরবর্তী দশকে ভূ-অবস্থানগত রাজনীতি ও ভৌগোলিক অবস্থানঘটিত অর্থনীতিই হয়তো ভারত-চীন সম্পর্কের আকার নির্ধারণ করবে, কিন্তু আপাতত এই নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকছে অর্থনৈতিক সেই বাধ্যবাধকতা যা এশিয়ার দুই অগ্রণী অর্থনীতিকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির অর্জনের প্রেক্ষাপটে একে অপরের আরও ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য করছে। আর এখানেই রয়েছে অমিত সম্ভাবনা, যা সত্যি অনন্ত, অসীম শুধু একথা মনে রেখে যে একে অপরের মূল স্বার্থগত দিকে পারস্পরিক সম্মান ও সংবেদনশীলতা বজায় রাখতেই হবে।

মেক ইন ইন্ডিয়া

এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রধানমন্ত্রী মোদী বেজিং-এ বলেছেন 'আমাদের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের জন্য আমরা এক উচ্চ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিস্পর্ধী উচ্চাশা গ্রহণ করেছি। নগরায়ণের মতো নানা দিকে বিপুল দ্বিপাক্ষিক সুযোগ আমাদের চোখে পড়েছে।' চীনা রাষ্ট্রপতি শি ও প্রধানমন্ত্রী লি-এর সঙ্গে তাঁর আলোচনার সূত্র ধরে শ্রী মোদী বলেছেন, 'আমাদের মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযানও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আরও বেশিমাত্রায় চীনের অংশগ্রহণের বিষয়ে উভয় নেতাই অত্যন্ত বেশি করে সমর্থনের মনোভাব নিয়েছেন।'

অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে পর্যাপ্ত সুফল তো মিলেছেই, আর সেইসঙ্গে কাজ এগিয়েও চলেছে। ভারতে আগামী পাঁচ বছরে চীনের ২০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি চীনা রাষ্ট্রপ্রধানের ভারত সফরকালে, ২০১৪-র সেপ্টেম্বরে দেওয়া হয়েছিল। তারই অঙ্গ হিসেবে গত ১৬ মে সাংহাই-তে দু'পক্ষের মধ্যে ২২০০ কোটি ডলারের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারত-চীন সিইও-দের ফোরামে তাঁর ভাষণে শ্রী মোদী দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আরও অনেক বাড়ানোর আহ্বান জানান। চীনা বাণিজ্যমহলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। যার মধ্যে চীনে ভারতের প্রতি পরিবর্তনশীল মনোভাবের প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে। শ্রী মোদীর চীন

সফরের বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে ভারতে চীনা রাষ্ট্রদূত লে ইয়ুচেং মেক ইন ইন্ডিয়া ও মেড ইন চায়না-র মধ্যে আরও বড়মাত্রায় তাল-মিলের কথা বলেছেন আর এক্ষেত্রে নতুন এক স্বাক্ষর 'মেক ইন চিন্ডিয়া'-কে আগামীর সম্ভাবনা হিসেবে তুলে ধরেছেন। এটি নিঃসন্দেহে এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে প্রস্তুতি ও বাণিজ্যক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতারই নিদর্শন। বাণিজ্য মহাসংঘ ফিকি চীন-ভারত শিল্প সহযোগিতা নিয়ে নতুন দিল্লিতে ১০ জুন যে আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল, সেখানে ভাষণ প্রসঙ্গে লে ইয়ুচেং বলেন চীন সম্প্রতি নতুন এক 'মেড ইন চায়না, ২০২৫' অভিযান হাতে নিয়েছে উদ্ভাবনীশক্তি আর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রস্তুতি ক্ষমতার ভিত্তিতে যা কিনা, ওঁর মতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে গৃহীত 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানের সঙ্গে মানানসই ও তার পরিপূরক।

চীনা দূতের বক্তব্যে জানা গেল যে চীনের বাণিজ্যমহল ভারতে নতুন সরকারের এ দেশে ব্যবসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব পোষণ তো করেই আর চীনা সংস্থাগুলি ভারতে প্রস্তুতক্ষেত্র (ম্যানুফ্যাকচারিং), মানবসম্পদ, স্থাবর সম্পত্তি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্মার্ট সিটি প্রকল্প ও রেলপথ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগে যথেষ্ট আগ্রহী।

যদিও বাড়তে থাকা ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্পর্ক দু'দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অবনতির ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না, যেটা চীন-জাপান সম্পর্কের দিক থেকে ভালো বোঝা যায়, কিন্তু অর্থনৈতিক প্রয়াস দু'দেশের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কমাবে আর উভয় পক্ষকেই সম্পর্কের অর্থনৈতিক মাত্রা আরও সুগভীর করার অসংখ্য সুফলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার দিকে নজর দিতে বাধ্য করবে। ভারত ও চীনের সম্পর্কের রূপান্তরের কাহিনিটা সেই জন্যই আরও বেশি মাত্রায় অর্থনৈতিক প্রয়াস ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে রচিত হয়ে চলেছে দীর্ঘমেয়াদি এক সম্পর্কের বুনোটে তাকে স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এই লক্ষ্যে গৃহীত সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত আর প্রয়াসের মধ্যে রয়েছে ভারতে নীতি আয়োগের সহাধ্যক্ষ আর চীনের এনডিআরসি-র চেয়ারম্যানের যৌথ পৌরোহিত্যে চলতি বছরের শেষার্ধে কৌশলগত অর্থনৈতিক সংলাপের আয়োজন করা এবং দু'দেশের বাণিজ্য মন্ত্রকের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি ব্যবসা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা।

উন্নয়ন অংশীদারিত্ব

দু'দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর উন্নয়ন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলাটা এই দুই এশীয় রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার পথ আরও আলোকিত করে তুলবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, মোদী সরকার পূর্বতন সরকারের করে যাওয়া কিছু ভালো কাজের ওপর ভিত্তি করে আরও এগিয়েছে। মে-র শীর্ষ বৈঠকে বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর মধ্যে রয়েছে—

(১) গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে চীনের সহায়তায় দুটি শিল্প-পার্ক গড়ে তোলা;

(২) চেন্নাই-বেঙ্গালুরু-মাইসোর রেলপথে ট্রেনের গতিবৃদ্ধি, দিল্লি-নাগপুর শাখায় ট্রেন-এর উচ্চগতিসম্পন্ন রেলপথ গড়ার বাস্তবতা সমীক্ষা এবং একটি রেল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা-সহ রেল প্রকল্পে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা;

(৩) চীনের গুয়াং ডং প্রদেশ ও এ দেশের গুজরাটের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বাড়ানোর পাশাপাশি গুয়াং ঝৌ নগর ও আমেদাবাদের মধ্যে নগর-ভগিনী সুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলা;

(৪) ভারতে জিআইএফটি নগর ও চীনের শেনজেন-এর মধ্যে পাইলট স্মার্ট সিটি প্রকল্প এবং

(৫) মুম্বই ও সাংহাই, আমেদাবাদ-গুয়াং ঝৌ, হায়দরাবাদ-কিংদাও, ঔরঙ্গাবাদ-দুনহুয়াং, চেন্নাই-চংকিং-এর মধ্যে নগর-ভগিনী সুলভ সম্পর্ক গড়া ও রাজ্য/প্রদেশ ভগিনীসুলভ সম্পর্কে গুজরাট ও গুয়াং ডং এবং কর্ণাটক ও সিচুয়ানকে বেঁধে ফেলা।

দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ : বিশ্বজোড়া সহযোগিতা

ভারত ও চীন, তাদের সম্পর্কের এক বিশ্বজোড়া দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের ব্যাপৃত রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ব-সম্পর্কিত ও পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয় বেছে নিয়েছে যার মধ্যে আছে জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাস, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা থেকে শুরু করে আফগানিস্তানে আরও বেশি মাত্রায় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং পশ্চিম এশিয়ার সংকট ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হল সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় মানানসই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি আর এ সম্পর্কে চীন-ভারতের দীর্ঘদিন ধরে উত্থাপিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ কনভেনশন-এর যথাশীঘ্র উপসংহারের দাবির প্রতি সমর্থন জানানোয় সুবিধা হয়েছে। মনমোহন সিং-এর সরকারের আমলে আফগানিস্তানে সহযোগিতার যে প্রয়াস শুরু হয় তা এই অঞ্চল ও পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি আরও ভালোভাবে নজরে রাখা হবে। এশিয়ার এই দুই শক্তি বহুপাক্ষিক ও নানা পাক্ষিক বিভিন্ন সংগঠন যেমন রাষ্ট্রসংঘ, ব্রিকস, জি-২০ ও এসসিও-তে সহযোগিতা ও সমন্বয় আরও বাড়িয়ে তুলছে।

শ্রী মোদীর চীন সফরের সময় জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার লক্ষ্যে এক পৃথক যৌথ বিবৃতি কিন্তু এটাও দেখিয়ে দিল যে কীভাবে এই দুই দেশ নিজেদের দ্বিপাক্ষিক মতপার্থক্য সামলে নিয়ে প্যারিসে অনুষ্ঠেয় ২১তম জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে আগামী ডিসেম্বরে এ বিষয়ে বিশ্ব জোড়া চুক্তির আকার নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। পুনর্ব্যবহার্য শক্তিক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত সমঝোতাগুলি ধারাবাহিক উন্নয়নে অংশীদারিত্বের প্রতি নজর দেওয়ার বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে। ওই যৌথ বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'এই দুই দেশ একসঙ্গে ও অন্য সব রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার গুরুত্ব অনুধাবন করে বছরের শেষে প্যারিসে অনুষ্ঠেয় ২১তম সম্মেলন থেকে ইউএনএফসিসিসি পর্যন্ত একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, পূর্ণাঙ্গ সর্বজনীন, সুষম ও সকলের পক্ষেই লাভজনক জলবায়ু চুক্তি সম্পাদনের প্রয়াস নিতে সম্মত হয়েছে যাতে ওই চুক্তি দ্বারা দুদেশের মধ্যে প্রকৃত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া অভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিবর্তন, কুপ্রভাব কমানো ও আর্থিক সহায়তার ব্যাপারে সহযোগিতায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সহজ হয়।'

২০১৫-২০২০ সালের মেয়াদে মহাকাশ সহযোগিতা চুক্তি এশিয়ার এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে

চীন এই প্রথম পারমাণবিক উপকরণ সরবরাহকারীগোষ্ঠীতে ভারতের যোগদানের আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ লাভের বিষয়ে ভারতের দাবির প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জানানোর প্রশ্নে চীন এখনও স্পষ্ট কিছু জানায়নি। ভারতের সদস্যপদের দাবিকে চীন সমর্থন জানালে তা হবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রূপান্তরের ক্ষেত্রে এক বিরাট কৃতিত্ব এবং দুদেশের মধ্যে আস্থার যে অভাব রয়েছে তা পূরণেও এ ব্যবস্থা অত্যন্ত সহায়ক হবে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এশিয়ার দুই মহারথীর উচিত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পরিসর বৃদ্ধি ঘটানো যাতে 'আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নে ব্যাঘাতকারী বিষয়গুলি' সম্পর্কে আঞ্চলিক ও বিশ্ব পর্যায়ে সক্রিয় আলোচনা হতে পারে। দুই 'প্রধান শক্তি'-র মধ্যে সম্পর্কের নতুন কাহিনি, যা প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর চীন সফরের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দুদেশের অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কের চালচিত্র হয়ে দাঁড়াবে আর দুই এশীয় মহারথী তাঁদের বর্ধনশীল অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক প্রোফাইল অনুসারে গোটা অঞ্চলকে বহন করে নিয়ে এশিয়ার শতকের অঙ্গীকার সফল করে তুলবে। পথে অবশ্যই অনেক বাধাবিপত্তি আছে—অসীমাংসিত সীমান্ত সমস্যা যখন-তখন উত্তেজনার উৎস হয়ে রয়েছে এখনও আর আস্থার অভাবটাও তো আছেই সেগুলোকে দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি আঙ্গিক থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটিকে বিচার করলে। আস্থাহীনতার ব্যাপকতা কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্কের গতি বিচ্যুতি ঘটাতেই পারে। ভারতীয় সংস্থাগুলি, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি, ফার্মা ও খাদ্য ক্ষেত্রের সংস্থাগুলিকে সে দেশের বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়ার দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি চীন কিন্তু এখনও পূরণ করেনি। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য চীনের পরিকল্পনা এবং শিল্প-পার্ক গড়ে তোলাটা ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে জীবনীশক্তি সঞ্চারের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এছাড়া তৃতীয় কোনও দেশের ক্ষেত্রে এই দুটি দেশ নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের কী বিন্যাস ঘটায় সেটাও দেখার। চীন-ভারত সম্পর্কের ধারাবাহিক রূপান্তরে তাই এসব বিষয়ের উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল সমাধান ও ভিন্ন ধরনের প্রয়াস গ্রহণ প্রয়োজন। চীনা প্রবাদ বলে সহস্র মাইলের এক সফর শুরু হয় ছোট্ট এক পদক্ষেপের মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে গেছে আর এখন দুদেশের নেতাদের নমনীয় মনোভাব দেখিয়ে আর কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়ে বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণের সময় সমাগত যার দ্বারা ভারত-চীন সম্পর্ক এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছবে এবং প্রতিযোগিতাসুলভ উচ্চাশা ও ভূ-রাজনৈতিক আবর্ত থেকে একে রক্ষা করবে।❑

[লেখক 'ইন্ডিয়া রাইটস্ নেটওয়ার্ক'-এর স্থাপক সিইও ও এডিটর-ইন-চিফ।
email : manish.mchand@gmail.com]

সাংস্কৃতিক কূটনীতি : হৃদয় ও মনস্পর্শী

সাংস্কৃতিক কূটনীতি আর মানুষে মানুষে সম্পর্কে আরও গভীরতার প্রতিফলন দেখা যাবে আগামী দিনের চীন-ভারত সম্পর্কে। এই দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর মোদীর সাম্প্রতিক চীন সফর মানুষে-মানুষে যোগাযোগকে প্রসারমান ভারত-চীন সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করার লক্ষ্যে নিয়োজিত ছিল। ভারত-চীন সম্পর্ক কত দূর যেতে পারে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথ ধরে, যোগ-তাইচি-র যৌথ আসর তাই দেখিয়ে দিল। বেজিং-এর টেম্পল অব্ হেভেন-এ গত ১৫ মে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও চীনা প্রধানমন্ত্রী লি-এর সামনে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা তাই-চি আর চীনা ছেলেমেয়েরা যোগাভ্যাস প্রদর্শন করে। শ্রী মোদী বলেন 'এই অনুষ্ঠানের জন্য টেম্পল অব্ হেভেন-কে বেছে নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতেই হয় কেননা আপনি যদি স্বর্গে যেতে চান তাহলে দেহ ও মনের ভারসাম্য প্রয়োজন, যোগ দেহ ও মনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল। আজ বিশ্বের সর্বত্র হতাশা দেখা যায় আর এই সমস্যার মোকাবিলায় সব থেকে সেরা উপায় হল যোগাভ্যাস।' তিনি বলেন, 'এ এক অবিশ্বাস্য সমাপতন যেখানে চীনা ছেলেমেয়েরা যোগাভ্যাস করছে আর ভারতীয়রা তাই-চি। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যুক্ত করার এ এক অসাধারণ মাধ্যম যাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।' দু'দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ যেখানে সাংহাই-এর ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়া হয়েছে সেন্টার ফর গান্ধীয়ান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান স্টাডিজ গড়া হয়েছে দ্বিপাক্ষিক থিংক-ট্যাংক ফোরাম; উচ্চ পর্যায়ের চীন-ভারত মিডিয়া ফোরাম; কুনমিং-এ একটি যোগ কলেজ গড়ার জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স-এর কষ্টকর কৈলাস মানস সরোবর যাত্রায় যেসব ভারতীয় তীর্থযাত্রী অংশগ্রহণ করেন তাঁদের জন্যও সুখবর রয়েছে। উভয়পক্ষ এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে যার মাধ্যমে বার্ষিক মানস সরোবরের যাত্রায় সিকিমের নাথুলা পাস দিয়ে অতিরিক্ত একটি পথ খোলা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস হয়ে বর্তমান পথটিও খোলা থাকবে। নাথুলা হয়ে নতুন পথটিতে দুর্গমতা অনেক কম, সময়ও যথেষ্ট কমবে আর তাই বয়স্কদের পক্ষে এই পথে যাওয়া সহজ হবে।

অন্যদিকে পর্যটন ও মানুষে-মানুষে যোগাযোগ বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী চীনা পর্যটকদের জন্য ই-ভিসা ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। বেজিং-এর শিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এ ঘোষণায় আপ্লুত। চীনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং য়ি প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে 'উপহার' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'এটা এক বড় খবর, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই উপহারদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত।' বর্তমানে চীনে ভারত ভ্রমণ করুন—২০১৫ বর্ষ চলছে। আগামী বছর চীন ভ্রমণ করুন—২০১৬ চলবে আর এর ফলে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বাড়বে। দুদেশের যৌথ চলচ্চিত্র প্রযোজনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরও এই দুটি দেশের মানুষের ধ্যান ধারণা বদলের ইঙ্গিতবাহী হতে পারে। থ্রি ইডিয়টস ও পিকে-র মতো ভারতীয় ছবি চীনে ভীষণ জনপ্রিয়। আর এর থেকেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সম্ভাবনার আঁচ পাওয়া যায়। জনপ্রিয় যে সংস্কৃতি তা দুই উত্থানশীল এশীয় শক্তির মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করতে পারে কেননা এই দুই রাষ্ট্র বহুদিন ধরেই মূল্যবোধ, পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানসিক বিকাশের জন্য চর্চা ও শিক্ষার গুরুত্ব একই রকম মর্যাদা পেয়ে থাকে।

সহযোগী যুক্তরাষ্ট্র, স্থানীয় শাসন ও ভারতের চতুর্দশ অর্থ কমিশন

কেন্দ্র-রাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক বিকাশ—এই সূত্র ধরেই জাতীয় উন্নয়ন হবে বলে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে ফারাক কতখানি? চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনের দিকে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাত করছেন **উৎপল চক্রবর্তী।**

ভারতীয় প্রশাসন কৃত্যক (IAS)-এর প্রাক্তন সদস্য তথা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI)-এর প্রাক্তন গভর্নর ড. ওয়াই. ভি. রেড্ডির নেতৃত্বে গঠিত ভারতের চতুর্দশ অর্থ কমিশন সম্প্রতি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ২০১৩ সালের ২ জানুয়ারি গঠিত এই কমিশন রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করতে সময় নিয়েছে দু'বছরের কিছু কম। ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক-এর পক্ষ থেকে এই কমিশন-এর সুপারিশ সংক্রান্ত গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল করা হয় চলতি বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই কমিশনের গৃহীত সুপারিশগুলির কার্যকাল হবে ২০১৫-১৬ থেকে ২০২০-২১।

ভারতীয় সংবিধানের ২৮০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ীকৃত রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কী হারে বণ্টিত হবে এবং রাজ্যভিত্তিক এই কেন্দ্রীয় কর কী হারে বণ্টিত হবে সে বিষয়ে সুপারিশ করা। পাশাপাশি সংবিধানের ২৭৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের সঞ্চিত তহবিল (কনসোলিডেটেড ফান্ড) থেকে রাজ্যগুলিকে কী পরিমাণে অনুদান দেওয়া হবে সে বিষয়ে সুপারিশ করার দায়িত্বও ছিল কমিশনের উপর। এই দায়িত্ব প্রতিপালন করতে গিয়ে কমিশন যেমন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছে তেমনি উভয় সরকারের অন্যান্য দায়বদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখেছে।

কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং হস্তান্তরের সূচক

যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর দাঁড়িয়ে এবং যে লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে চতুর্দশ অর্থ কমিশন তাদের সুপারিশগুলিকে প্রতিবেদনভুক্ত করেছে তা হল রাজ্যগুলির হাতে আরও বেশি আর্থিক ক্ষমতা, উন্নয়নের জন্য আরও অর্থ এবং কেন্দ্র-রাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক বিকাশ। কমিশন আরও মনে করেছে যে, ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিণত রাজ্যগুলির উন্নয়নের বিষয়ে কেন্দ্র থেকে গৃহীত কেন্দ্রীয় কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে রাজ্যস্তরেই স্থানীয় উন্নয়নের দিশা নির্ধারণ করতে দেওয়া সমীচীন হবে। কারণ কেন্দ্রীয় কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য এবং যৌথ তালিকায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিষয়ে রাজ্যগুলি সাম্প্রতিক অতীতে বহুবার সোচ্চার হয়েছে।

আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কমিশন যে সকল সূচক ব্যবহার করেছে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বিষয়ক পরিবর্তন, আয়ের ব্যবধান, আয়তন এবং বনাঞ্চল-এর পরিমাণ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মূল্য যুক্ত করা হয়েছে আয়ের ব্যবধান এবং জনসংখ্যার ক্ষেত্রে। [সারণি-১]

সহযোগী যুক্তরাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টন

কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের প্রশ্নে সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাটি ভারতে আলোচিত হচ্ছে বেশ কিছু সময় ধরে, অতীতে বিভিন্ন সময়ে প্রথম প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি (১৯৬৬), সারকারিয়া কমিশন (১৯৮৮), বিচারপতি ভেঙ্কট চালিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান-এর কার্যকারিতা বিষয়ক জাতীয় কমিশন (২০০২), কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিষয়ক এম. এম. পুঞ্জি কমিশন (২০১০) এবং বি. কে. চতুর্বেদীর নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচি

সারণি-১
বিভিন্ন সূচক ও তাদের মূল্যমান

সূচক	মূল্যমান (শতাংশ)
জনসংখ্যা	১৭.৫
জনসংখ্যা পরিবর্তন	১০.০
আয়ের ব্যবধান	৫০.০
আয়তন	১৫.০
বনাঞ্চল	৭.৫
মোট	১০০.০০

সূত্র : চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন।

বিষয়ক কমিটি (২০১১) এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করেছে। এই সমস্ত কমিটি এবং কমিশনগুলির বক্তব্যের মূল সুর ছিল, সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির প্রতিফলন হিসাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, বার্ধক্যের নিরাপত্তা এবং রাজ্যগুলির আয়ের বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রশ্নে কেন্দ্রের ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য, অন্যদিকে সংবিধান প্রদত্ত দায়িত্ব প্রতিপালন সহ আঞ্চলিক চাহিদার প্রতি যথাযথ মর্যাদার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সংখ্যাও কমিয়ে আনা একান্ত জরুরি। অন্যদিকে একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন ও কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সংখ্যা হ্রাস করে রাজ্যগুলির হাতে আর্থিক স্বাধীনতা হস্তান্তরের পক্ষে সওয়াল করে।

ভারতের সাম্প্রতিককালে পরিকল্পনা কমিশন-এর পরিবর্তে নীতি আয়োগ (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া) গঠনের মধ্যে দিয়ে পুনরায় এই সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (কো-অপারেটিভ ফেডেরালিজম) ধারণাটিকে নতুন করে সামনে আনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করার সময় থেকেই গণপরিষদে এ বিষয়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদের আর্থিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি যে প্রতিবেদন দাখিল করে তার সুপারিশ ছিল কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে দুই জন সদস্য মনোনয়ন করা হোক রাজ্যগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং বাকি দুই জন কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী। কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের দায়িত্ব থাক রাষ্ট্রপতির উপর। এই সুপারিশ অবশ্য বাস্তবে গৃহীত হয়নি। পরিবর্তে ২৬৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিয়োজিত আন্তঃরাজ্য পর্ষদের উপরই এই দায়িত্ব ছেড়ে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে সারকারিয়া কমিশনও জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ (ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল)-এর নাম পরিবর্তন করে জাতীয় অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন পর্ষদ (ন্যাশনাল ইকোনমিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল) করার প্রস্তাব দেয়। যদিও বাস্তবে ১৯৯০ সালের ২৮ মে রাষ্ট্রপতির একটি আদেশের মাধ্যমে আন্তঃরাজ্য পর্ষদ গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি (২০০৫) সহ অন্যান্য কমিটিও এই প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করার পক্ষে জোরালো সওয়াল করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি আসলে নিছক সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

চতুর্দশ অর্থ কমিশন, এই প্রেক্ষাপটেই আন্তঃরাজ্য পর্ষদকে কার্যকরী করার পক্ষে সুপারিশ করে এবং এই পর্ষদের দায়িত্ব হিসাবে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করে তা হল: (১) রাজ্যের যে ক্ষেত্রগুলি কেন্দ্রীয় অনুদান পাবার যোগ্য সেগুলি চিহ্নিত করা। (২) আন্তঃরাজ্য অনুদান বণ্টনের পদ্ধতি নির্ধারণ করা। (৩) রাজ্যস্তরে স্থানীয় চরিত্রের প্রেক্ষাপটে শিথিলযোগ্য কর্মসূচির রূপরেখা স্থির করতে সহায়তা করা। (৪) অঞ্চলভিত্তিক অনুদান চিহ্নিত করা। (৫) উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সম্পদ চিহ্নিত করা যার সাহায্যে আন্তঃরাজ্য পরিকাঠামোগত কর্মসূচি রূপায়ণ করা যায় এবং (৬) অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমন্বয় কার্যকরী করা।

কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের প্রশ্নে কমিশন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছে। প্রথমত, নিট আদায়ীকৃত কর বণ্টন এবং দ্বিতীয়ত রাজ্যগুলিকে দেয় অনুদান। কেন্দ্রের আদায়ীকৃত কর বণ্টনের ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ হল ৪২ শতাংশ আদায়ীকৃত কর রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করা। এক্ষেত্রে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ ছিল ৩২ শতাংশ। অর্থাৎ রাজ্যগুলির প্রাপ্য বেড়েছে ১০ শতাংশ, এবং এটিই ভারতে এ পর্যন্ত গঠিত অর্থ কমিশনগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ সুপারিশ। কারণ অতীতে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১ থেকে ২ শতাংশ। হিসাব করে দেখা গেছে সব মিলিয়ে ২০১৪-১৫'র অনুপাতে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে রাজ্যগুলিকে হস্তান্তরিত আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ৪৫ শতাংশ।

অন্যদিকে কমিশন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে বিশেষ অনুদান, বিপর্যয় মোকাবিলা বাবদ অনুদান এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির পরিষেবা সরবরাহ বাবদ অনুদান হিসাবে মোট ৫,৩৭,৩৫৪ কোটি টাকা অনুদান সুপারিশ করেছে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের জন্য। পিছিয়ে পড়া এই রাজ্যগুলির তালিকায় রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ। ক্ষেত্রভিত্তিক অনুদানের ধারণা পাওয়া যাবে সারণি-২ থেকে।

হিসাব করে দেখা যায়, কর এবং অনুদান বাবদ ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে রাজ্যগুলির মোট প্রাপ্য দাঁড়ায় ৪৪.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা (সারণি-৩)। কমিশন মনে করেছে রাজ্যগুলিকে এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তর সত্ত্বেও কেন্দ্র আগের মতোই শক্তিশালী থাকবে যদি সম্ভাব্য রাজস্ব আদায়ের সূত্রগুলি যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যগুলির হাতে এই বিপুল আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর চলতি কেন্দ্রীয় কর্মসূচিগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে। প্রাথমিক ভাবে উচ্চ আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ৩০টি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির কথা ভাবা হয়েছিল, যার রূপায়ণের দায়িত্ব আসবে রাজ্যগুলির হাতে। কিন্তু যেহেতু এই কর্মসূচিগুলির

সারণি-২
রাজ্যগুলিকে দেয় অনুদান

[কোটি টাকায়]

ক্ষেত্র	পরিমাণ
(১) রাজস্ব ঘাটতি বাবদ	১,৯৪,৮২১
(২) বিপর্যয় মোকাবিলা	৫৫,০৯৭
(৩) স্থানীয় সরকার	২,৮৭,৪৩৬
মোট	৫,৩৭,৩৫৪

সূত্র : চতুর্দশ অর্থ কমিশন-এর প্রতিবেদন।

সারণি-৩
আর্থিক হস্তান্তর

(লক্ষ কোটি টাকায়)

হস্তান্তরের উৎস	আর্থিক স্তর					
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	মোট
আদায়ীকৃত কর বাবদ	৫.৭৯	৬.৬৮	৭.৭২	৮.৯৩	১০.৩৫	৩৯.৪৮
অনুদান বাবদ	০.৮৮	১.০০	১.০৩	১.১১	১.৩৩	৫.৩৭
মোট	৬.৬৮	৭.৬৯	৮.৭৫	১০.০৪	১১.৬৮	৪৪.৮৫

সূত্র : চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন।

অধিকাংশই কেন্দ্রীয় স্তরে অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং অনেকগুলি কর্মসূচির সঙ্গেই আইনের বাধ্যবাধকতা জড়িয়ে রয়েছে (যেমন মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন)। ফলে ২০১৫-১৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে মোট ১১টি কর্মসূচিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির তালিকা থেকে বিযুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পশ্চাদপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল (ব্যাকওয়ার্ড রিজিওয়ন গ্রান্ট ফান্ড), কেন্দ্রীয় সহায়তা কর্মসূচি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আগামীতে রাজ্যগুলিকে আরও কিছু সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। কারণ কেন্দ্র যদি সম্ভাব্য (প্রোজেক্টেড) হারে রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলিও কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির বরাদ্দ, রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অর্থাৎ নিম্নহারে রাজস্ব আদায় হলেও কেন্দ্রীয় কর্মসূচির বরাদ্দের ব্যতিক্রম হয়নি। এই সমস্যা মাথায় রেখেই রাজ্যগুলিকে ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণ করতে হবে। সারণি-৪ থেকে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের ব্যবহৃত সূচক অনুযায়ী প্রাপ্ত হার এবং ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত হার-এর একটা তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যাবে।

দেখা যাচ্ছে, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বর্তমান সূচক অনুযায়ী রাজ্যগুলির রাজস্ব প্রাপ্তির হার বেশ কিছু পরিবর্তনের সম্মুখীন হবে। প্রথমত অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ভেঙে তেলেঙ্গানা গঠনের ফলে উভয়ের যুক্ত অংশ অতীতের অন্ধ্রপ্রদেশের অনুপাতে কম হবে। দ্বিতীয়ত, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু,

সারণি-৪
বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্ত হার

[শতাংশ]

রাজ্য	চতুর্দশ অর্থ কমিশন	ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪.৩১	৬.৯৪
অরুণাচলপ্রদেশ	১.৩৭	০.৩৩
আসাম	৩.৩১	৩.৬৩
বিহার	৯.৬৭	১০.৯২
ছত্তিশগড়	৩.০৮	২.৪৭
গোয়া	০.৩৮	০.২৭
গুজরাট	৩.০৮	৩.০৪
হরিয়ানা	১.০৮	১.০৫
হিমাচলপ্রদেশ	০.৭১	০.৭৮
জম্মু ও কাশ্মীর	১.৮৫	১.৫৫
ঝাড়খণ্ড	৩.১৪	২.৮০
কর্ণাটক	৪.৭১	৪.৩৩
কেরালা	২.৫০	২.৩৪
মধ্যপ্রদেশ	৫.৫২	৫.২০
মণিপুর	০.৬২	০.৪৫
মেঘালয়	০.৬৪	০.৪১
মিজোরাম	০.৪৬	০.২৭
নাগাল্যান্ড	০.৫০	০.৩১
ওড়িশা	৪.৬৪	৪.৭৮
পাঞ্জাব	১.৫৮	১.৩৯
রাজস্থান	৫.৫০	৫.৮৫
সিকিম	০.৩৭	০.২৪
তামিলনাড়ু	৪.০২	৪.৯৭
তেলেঙ্গানা	২.৪৪	—
ত্রিপুরা	০.৬৪	০.৫১
উত্তরপ্রদেশ	১৭.৯৬	১৯.৬৮
উত্তরাখণ্ড	১.০৫	১.১২
পশ্চিমবঙ্গ	৭.৩৭	৭.২৬
সমস্ত রাজ্য	১০০.০০	১০০.০০

সূত্র : চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন।

ওড়িশা, রাজস্থান, বিহার, আসাম এবং হিমাচলপ্রদেশের অংশ অতীতের চেয়ে কম হবে। তৃতীয়ত, আসাম ছাড়া উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি অতীতের চেয়ে কিছু বেশি অংশ পাবে। চতুর্থত, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের অংশ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং যা মোট হস্তান্তরের প্রায় ৫৪ শতাংশ।

স্থানীয় শাসন : নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলির গুরুত্ব আলোচিত হচ্ছে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের সূত্র ধরে। দশম অর্থ কমিশনই প্রথম তাদের অর্পিত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে এই সংস্থাগুলির ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য পৃথক অনুদান সুপারিশ করে। পরবর্তীতে অবশ্য সংবিধান সংশোধন করে অর্থ কমিশনের পরিধির মধ্যে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলিকেও যুক্ত করা হয়। ফলে একাদশ থেকে পরবর্তী অর্থ কমিশনগুলির অর্পিত দায়িত্বের মধ্যেই এই সংস্থাগুলির জন্য সুপারিশ করার বিষয়টি যুক্ত হয়ে পড়ে।

রাজ্য অর্থ কমিশনগুলির গঠনের সময়সীমা, প্রতিবেদন দাখিল, গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের প্রতিবেদন এবং সর্বোপরি প্রতিবেদনের গঠনগত তারতম্য ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্যগুলির বিভিন্নতার কারণে অতীতের কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনগুলি এই সংস্থাগুলির জন্য আর্থিক অনুদান সুপারিশ করলেও রাজ্য অর্থ কমিশনগুলির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই সংস্থাগুলির বিস্তারিত কার্যক্রম খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

অন্যদিকে একাদশ অর্থ কমিশনের সময় থেকেই স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রদত্ত প্রধান পরিষেবাগুলি যেমন পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধান, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, বর্জ্যপদার্থ, রাস্তার আলো ইত্যাদির মান উন্নয়নের প্রশ্নটি আলোচিত হচ্ছে। এই পরিষেবাগুলির মানোন্নয়ন ঘটলে সংস্থাগুলি উন্নত পরিষেবা কর পাবে যা তাদের নিজস্ব আয়ের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করবে।

চতুর্দশ অর্থ কমিশন এই প্রেক্ষাপটেই স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য কেবল পরিষেবা সরবরাহ বাবদ অনুদান বরাদ্দের সুপারিশ করেছে। এই সুপারিশের ক্ষেত্রে কমিশন ২০১১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে যে সূচক দুটি ব্যবহার করেছে তা হল জনসংখ্যা (৯০ শতাংশ) এবং আয়তন (১০ শতাংশ)। অনুদান পাওয়া যাবে দুভাবে—বেসিক গ্রান্ট এবং পারফরমেন্স গ্রান্ট। পঞ্চায়েতগুলির ক্ষেত্রে এই দুটি অনুদানের অনুপাত হবে ৯০: ১০ এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে ৮০: ২০। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ এই সময় কালের জন্য কমিশন মোট ২.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা সুপারিশ করেছে এই সংস্থাগুলির জন্য, যার মধ্যে ২.০০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে পঞ্চায়েতগুলির জন্য এবং ০.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা পৌরসভাগুলির জন্য। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-২০ সময়কালের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ হবে ৪৮৮ টাকা।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পারফরমেন্স গ্রান্ট পাবার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলিকে যে শর্ত পূরণ করতে হবে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে সারণি-৫ থেকে।

চতুর্দশ অর্থ কমিশন মনে করেছে পৌরসভাগুলির পরিষেবা সরবরাহের প্রশ্নে তাদের সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। এক্ষেত্রে অর্থ কমিশনের অনুদান কিছুটা সহায়ক হলেও যথেষ্ট নয়। ফলে, কমিশনের সুপারিশ হল রাজ্য সরকারগুলির উচিত পৌরসভাগুলিকে বাজার থেকে বন্ড সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মধ্যমানের পৌরসভাগুলি সরাসরি বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহে সক্ষম নয়। ফলে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়ে কোনও সংস্থাকে এই পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত করলে (যে সংস্থা বাজারের সঙ্গে আলোচনায় পারদর্শী), পৌরসভাগুলি সরাসরি বাজার থেকে লগ্নি সংগ্রহ করতে পারে। পৌর এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প স্থাপন এবং নতুন বাজারের সম্প্রসারণের প্রশ্নে উদার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। এমনটাই মনে করা যেতে পারে।

একস্তরীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ পরিষেবা

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং প্রশ্নবোধক দিকটি হল কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আওতা থেকে মধ্যবর্তী স্তর এবং জেলা স্তরের পঞ্চায়েতগুলিকে বাদ দেওয়া। কমিশনের স্পষ্ট সুপারিশ হল, পঞ্চায়েতের অন্য কোনও স্তরে নয়, অনুদান বরাদ্দ হবে শুধুমাত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে যারা গ্রামীণ পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ। কমিশনের প্রত্যাশা, পঞ্চায়েতের অন্যান্য স্তরগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলি যথাযথ দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

সংবিধানের নবম অংশের বিধান অনুযায়ী ২০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে এমন সমস্ত রাজ্যেই গ্রাম, জেলা এবং মধ্যবর্তী

সারণি-৫
পারফরমেন্স গ্রান্ট পাবার শর্ত

পঞ্চায়েত	পৌরসভা
(১) যে বছরের অনুদান দাবি করা হবে তার অন্তত দু বছর আগের নিরীক্ষিত হিসাব দাখিল।	(১) যে বছরের অনুদান দাবি করা হবে তার অন্তত দু বছর আগের নিরীক্ষিত হিসাব দাখিল।
(২) বিগত বছরের অনুপাতে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি, যার প্রতিফলন থাকবে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে।	(২) বিগত বছরের অনুপাতে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি, যার প্রতিফলন থাকবে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে।
	(৩) প্রতি বছর কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্ধারিত বেঞ্চমার্ক অনুযায়ী পরিষেবা সরবরাহের বেঞ্চমার্ক প্রকাশ এবং জনসাধারণের গোচরে আনা।

সূত্র : চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন।

সারণি-৬
রাজ্যভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রদত্ত বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

রাজ্য	গ্রান্ট	বরাদ্দ (বার্ষিক)					
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৫-২০
বিহার	বেসিক	২২৬৯.১৮	৩১৪২.০৮	৩৬৩০.৬৯	৪১৯৯.৭১	৫৬৭৪.৭০	১৮৯১৬.০৫
	পারফরমেন্স	—*	৪১২.১৫	৪৬৬.৪১	৫২৯.৬৭	৬৯৩.৫৫	২১০১.৭৮
	মোট	২২৬৯.১৮	৩৫৫৪.২৩	৪০৯৬.৪১	৪৭২৯.৩৮	৬৩৬৮.২৫	২১০১৭.৮৩
মধ্যপ্রদেশ	বেসিক	১৪৬৩.৬১	২০২৬.৬২	২৩৪১.৫৭	২৭০৮.৭৮	৩৬৬০.১৪	১২২০০.৭২
	পারফরমেন্স	—	২৬৫.৮৪	৩০০.৮৩	৩৪১.৬৩	৪৪৭.৩৪	১৩৫৫.৬৪
	মোট	১৪৬৩.৬১	২২৯২.৪৬	২৬৪২.৪০	৩০৫০.৪১	৪১০৭.৪৮	১৩৫৫৭.৩৬
মহারাষ্ট্র	বেসিক	১৬২৩.৩২	২২৪৭,৭৭	২৫৯৭.১০	৩০০৪.৩৭	৪০৫৯.৫৫	১৩৫৩২.১১
	পারফরমেন্স	—	২৯৪.৮৪	৩৩৩.৬৬	৩৭৮.৯১	৪৯৬.১৫	১৫০৩.৫৭
	মোট	১৬২৩.৩২	২৫৪৬.৬১	২৯৩০.৭৬	৩৩৮৩.২৮	৪৫৫৫.৭০	১৫০৩৫.৬৮
রাজস্থান	বেসিক	১৪৭১.৯৫	২০৩৮.১৭	২৩৫৪.৯২	২৭২৪.২২	৩৬৮১.০১	১২২৭০.২৭
	পারফরমেন্স	—	২৬৭.৩৫	৩০২.৫৫	৩৪৩.৫৮	৪৪৯.৮৯	১৩৬৩.৩৬
	মোট	১৪৭১.৯৫	২৩০৫.৫২	২৬৫৭.৪৭	৩০৬৭.৮০	৪১৩০.৯০	১৩৬৩৩.৬৩
উত্তরপ্রদেশ	বেসিক	৩৮৬২.৬০	৫৩৪৮.৪৫	৬১৭৯.৬৫	৭১৪৮.৭৪	৯৬৫৯.৪৭	৩২১৯৮.৯০
	পারফরমেন্স	—	৭০১.৫৭	৭৯৩.৯২	৯০১.৬০	১১৮০.৫৭	৩৫৭৭.৬৬
	মোট	৩৮৬২.৬০	৬০৫০.০২	৬৯৭৩.৫৭	৮০৫০.৩৪	১০৮৪০.০৪	৩৫৭৭৬.৫৬
পশ্চিমবঙ্গ	বেসিক	১৫৩২.২১	২১২১.৬১	২৪৫১.৩৩	২৮৩৫.৭৫	৩৮৩১.৭০	১২৭৭২.৬০
	পারফরমেন্স	—	২৭৮.৩০	৩১৪.৯৩	৩৫৭.৬৪	৪৬৮.৩১	১৪১৯.১৮
	মোট	১৫৩২.২১	২৩৯৯.৯১	২৭৬৬.২৬	৩১৯৩.৩৯	৪৩০০.০১	১৪১৯১.৭৮

সূত্র : চতুর্দশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন।

*প্রথম বছরের জন্য কোনও পারফরমেন্স গ্রান্ট বরাদ্দ হয়নি।

স্তরে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত গঠন বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র ২০ লক্ষের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই মধ্যবর্তী স্তরে পঞ্চায়েত গঠন বাধ্যতামূলক নয়। এদিক থেকে বিচার করলে সিকিম ছাড়া ভারতের সমস্ত রাজ্যেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে।

রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টিতে এ তাবৎ রাজ্য সরকারগুলি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির দায়ভার বহন করলেও, অনেক রাজ্যেই কেন্দ্রীয় কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব যেমন পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই অর্পণ করা হয়েছে তেমনি দশম অর্থ কমিশনের সময় থেকেই কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের বরাদ্দ পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই বণ্টন করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট সুপারিশ থাকেনি। পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য আরও কয়েকটি রাজ্যের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করা যায়, জেলা এবং মধ্যবর্তী স্তরের পঞ্চায়েতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতোই পানীয় জল, রাস্তার আলো, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং রক্ষণাবেক্ষণের মতো পরিষেবা সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। অন্যদিকে দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত সড়ক ব্যবস্থা অথবা অন্যান্য কর্মসূচির রূপায়ণের দায়িত্ব যেমন মধ্যবর্তী স্তরের পঞ্চায়েতগুলির উপর অর্পিত হয়েছে, তেমনি দুই বা তার বেশি মধ্যবর্তী পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব এসেছে জেলা পঞ্চায়েতের উপর। এই সমস্ত কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে কেন্দ্র এবং রাজ্য অর্থ কমিশন সহ অন্যান্য গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে।

এক্ষেত্রে আরও যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল অবস্থানগত কারণেই উন্নত মানব সম্পদ রয়েছে জেলা এবং মধ্যবর্তী পঞ্চায়েতগুলিতে। কারণ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীন ভারতের সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে জেলা স্তরে জেলা বোর্ড এবং মধ্যবর্তী স্তরে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক-এর প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ রাজ্যেই জেলা এবং

মধ্যবর্তী পঞ্চায়েতগুলি ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে অধিক অর্থ অথচ সীমিত মানব সম্পদ, অন্যদিকে অপর দুটি স্তরে উন্নত মানব সম্পদ অথচ সীমিত অর্থ—ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য করবে। সারণি-৬ থেকে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া আর্থিক বরাদ্দ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অনুকূলে সুনির্দিষ্ট পরিষেবা সরবরাহের জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার ফলে রাজ্যগুলিকে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। প্রথমত, অধিকাংশ রাজ্যের আইনেই এই পরিষেবা সরবরাহের ধারণাটি সুস্পষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিষেবা সরবরাহের দায়িত্ব তিনটি স্তরেই ন্যস্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন একান্ত জরুরি। দ্বিতীয়ত, পরিষেবা সরবরাহের মাধ্যমে বাড়তি কর দাবি করলে অবশ্যই পরিষেবা সরবরাহের নির্ধারিত বেঞ্চমার্ক একান্ত জরুরি। কারণ শহর অঞ্চলের মতো গ্রামাঞ্চলেও পঞ্চায়েতগুলির কাছে মানুষের প্রত্যাশা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয়ত, মধ্যবর্তী এবং জেলা স্তরের পঞ্চায়েতগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য রাজ্যগুলিকে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। রাজ্য অর্থ কমিশনগুলির মাধ্যমে দুটি স্তরের এই ঘাটতি কিছুটা পূরণ করা যেতে পারে। অথবা কেন্দ্রীয় করের যে বর্ধিত অংশ রাজ্যগুলি পেতে চলেছে তার একটি অংশ পঞ্চায়েতের বাকি দুটি স্তরের অনুকূলে বরাদ্দ করা যেতে পারে।

সমস্যা হল, অধিকাংশ রাজ্যেই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা হিসাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব থাকলেও, স্তরভিত্তিক দায়িত্ব বিভাজনের রূপরেখাটি যেমন সুস্পষ্ট নয়। অন্যদিকে সমান্তরাল সংস্থাগুলির (Parastatals) মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নের একাধিক বিষয় বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি নিয়ে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে যতই চর্চা হোক না কেন, সুশাসনের প্রশ্নে স্থানীয় মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি অধরাই থেকে গেছে।

ইতিমধ্যেই কোনও কোনও গবেষক ভারতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের মধ্যে অনেকের অভিমত শহরাঞ্চলের পৌর সংস্থাগুলির মতো গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও একস্তর বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁরা আরও মনে করেন যে গ্রামীণ পরিষেবা যে স্তরের মাধ্যমেই দেওয়া হোক না কেন আসলে তা সুনির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর স্বার্থকেই সিদ্ধ করে। এখনও মনে করা হচ্ছে যে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জেলা পরিকল্পনা কমিটিকে আরও বেশি সক্রিয় এবং শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে জেলা স্তরের পঞ্চায়েতকে এই সংস্থার সঙ্গে একত্রিত করা যেতে পারে। অন্যদিকে মধ্যবর্তী পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের তদারকির কাজে যুক্ত করা যেতে পারে এবং তাদের বাড়তি মানবসম্পদ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অনুকূলে দেওয়া যেতে পারে। বিতর্কটি শুধু গভীর নয়, ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ গ্রামীণ প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যের পুনর্বিন্যাস এবং আইনের পরিকাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। চতুর্দশ অর্থ কমিশন এই বিতর্কটিকেই নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে, ভারতের সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণার প্রেক্ষাপটে। ❑

[লেখক প্রাক্তন অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।
email : utpal1960@gmail.com]

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১৬ মে ২০১৫—১৫ জুন ২০১৫)

বহির্বিশ্ব

● **স্বাক্ষরিত হল স্থলসীমান্ত চুক্তি :**

অবশেষে স্বাক্ষরিত হল ঐতিহাসিক স্থলসীমান্ত চুক্তি। নরেন্দ্র মোদী, শেখ হাসিনা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ৬ জুন ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয় চুক্তিটি।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর মে মাসে সংসদের দু'কক্ষেই সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমান্ত চুক্তিটি। এ দিনের চুক্তি স্বাক্ষরের পর দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক ধাক্কায় অনেকটাই এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী দু'পক্ষই।

ছিটমহল থাকার প্রত্যক্ষ প্রভাবের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ জড়িত। ৫ জুন সন্ধ্যায় পৌঁছেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পরের দিন সকালে দু'দিনের বাংলাদেশ সফরে পৌঁছালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ দিন সকাল পৌনে দশটা নাগাদ ঢাকায় এসে পৌঁছায় প্রধানমন্ত্রীর বিমান।

● **নেপালে ধস, মৃত ৪১ :**

ভূমিকম্পের আতঙ্ক কাটার আগেই ফের বিপর্যয় নেপালে। ১২ জুন রাতে ধস নামায় তাপলেজুং জেলার ছ'টি গ্রামে মৃত্যু হল ৪১ জনের। আহত আট।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কাঠমান্ডু থেকে ৫০০ কিলোমিটার পূর্বে তাপলেজুং-এ সেদিন রাতে হঠাৎই ধস নামে। ছ'টি গ্রাম গুঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে অতিবৃষ্টির ফলেই এই ধস। পুলিশ জানিয়েছে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা। সারা দিন বৃষ্টি আর হড়পা বানে উদ্ধার কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। কুয়াশার জন্য নামতে পারেনি হেলিকপ্টারও। বৃষ্টি-ধসের জেরে মেচি হাইওয়েতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে যান চলাচল। এদিনও ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পনে দু'বার কেঁপে উঠেছে নেপাল।

● **জাপানে ভূমিকম্প :**

ভূমিকম্পের জেরে ৩১ মে কেঁপে উঠল জাপান। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে জানাচ্ছে, এ দিন রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৮। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল টোকিও থেকে ৮৭৪ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রগহ্বরে ৬৬০ কিলোমিটারেরও বেশি গভীরে। সেখানে কম্পনমাত্রা ছিল ৮.৫।

তবে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। ভূমিকম্পের জেরে সাময়িক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। হতাহতের খবর নেই। এদিন দিল্লি ও তার নিকটবর্তী কিছু এলাকাতেও মৃদু কম্পন অনুভব করা গিয়েছে।

● **আর এক রাজাকারের প্রাণদণ্ডের রায় :**

একাত্তরে মানবতা-বিরোধী অপরাধের দায়ে কিশোরগঞ্জের তৎকালীন রাজাকার কম্যান্ডার সৈয়দ মহম্মদ হাসান আলিকে ১০ জুন প্রাণদণ্ড দিল ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একটি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১১ জন-সহ মোট ১২ জনকে ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়ে খুন, লুঠপাট, আগুন লাগানোর পাঁচটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এই জামাত নেতাকে। তাঁকে ফাঁসি অথবা ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারকরা। এর আগে মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল শেষ বার। তবে হাসান আলি বিচার শুরুর আগে থেকেই পলাতক।

● **১১ জনের মৃত্যুদণ্ড :**

মিশরের ফুটবল স্টেডিয়াম সংঘর্ষের ঘটনায় ১১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত (১০ জুন, ২০১৫)। ২০১২ সালের ওই মারাত্মক ঘটনাটি ঘটে পোর্ট সৈয়দ স্টেডিয়ামে। প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্তত ৭০ জন। পাশাপাশি, জখম হন প্রায় এক হাজারেরও বেশি ফুটবল সমর্থক।

তবে অভিযুক্তদের অনেকেরই কয়েক বছরের জেলও হয়েছে। আবার, অনেকেই নির্দোষ প্রমাণ হওয়ায় তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

● **সীমান্তপারের সন্ত্রাসে বিদ্ধ ভারত-বেলারুস :**

সন্ত্রাস দমনে ভারতের সঙ্গে একযোগে লড়ার প্রতিশ্রুতি দিল বেলারুস। একজনের প্রতিবেশী পাকিস্তান। আর একজনের ইউক্রেন। এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কারণেই সন্ত্রাস সমস্যায় জর্জরিত ভারত এবং বেলারুস। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বেলারুস সফরের পর এই সিদ্ধান্ত নিল উভয় পক্ষ। এছাড়া প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি বিনিময়ের উপর জোর দিয়েছে উভয় দেশ।

দু'দিনের বেলারুস সফরে সন্ত্রাস প্রশ্নে প্রণব মুখোপাধ্যায়কেও বহুবার সরব হতে দেখা গিয়েছে। তাঁর মতে, সন্ত্রাস কোনও দেশের বা অঞ্চলের সমস্যা নয়। এটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। তাঁর মতে, সন্ত্রাস দমনে তাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে আরও বেশি করে সংঘবদ্ধ 'নেটওয়ার্ক' গড়ে ওঠা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলিকে একযোগে কাজ করতে হবে। সুইডেন সফরেও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি।

এ দিকে সুইডেনের মতো বেলারুসও যেভাবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে সমর্থন করছে তাতে আশাবাদী বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রকের ব্যাখ্যা, গত কয়েক বছরে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ভারতের দাবির পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে সংস্কারের প্রশ্নে ভোটাভুটি হলে ভারতের পক্ষেই পাল্লা ভারী হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

● **ঘানায় জোড়া দুর্যোগে মৃত বেড়ে দেড়শো :**

টানা দু'দিনের বৃষ্টি ও পেট্রোল পাম্পে বিস্ফোরণ—এই দুইয়ের ধাক্কায় কার্যত বিপর্যস্ত ঘানার রাজধানী আক্রা। এমন দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার বলি হয়েছেন অন্তত ১৫০ জন। ৬ জুন এমনটাই জানিয়েছেন ঘানার প্রেসিডেন্ট জন দ্রামানি মাহামা। পেট্রোল পাম্পে বিস্ফোরণের ঘটনায় পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মৃতের সংখ্যা। প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, বন্যা ও বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে সরকারের তরফ থেকে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার দেওয়া হবে।

দু'দিনের বৃষ্টিতে আক্রার বহু এলাকাই বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। ভেসে যায় বহু ঘর-বাড়িও। প্রাণ বাঁচাতে বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল মধ্য আক্রার একটি পেট্রোল পাম্পে এবং আশপাশের কয়েকটি দোকানে। সেই সময় ভয়াবহ একটি বিস্ফোরণ হয়। আশপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

● **গণভোটে সমকামী বিয়ে বৈধ আয়ার্ল্যান্ডে :**

সমকামী বিয়েতে ২৪ মে সিলমোহর লাগিয়ে দিলেন আয়ার্ল্যান্ডের অধিকাংশ মানুষ। মোটামুটি ১৬টা কেন্দ্রের ভোট গোনা শেষ হতেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রায় ৬৫ শতাংশ দেশবাসী ভোট দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, একই লিঙ্গের দুই মানুষের বিয়েতে কোনও আপত্তি নেই তাঁদের। ডাবলিন, লিমেরিক, ওয়াটারফোর্ড—সর্বত্র হইহই করে জিতেছেন 'ইয়েস'পন্থীরা। আর এই ফলাফলের জেরে খুব তাড়াতাড়ি সংশোধন করা হবে দেশের সংবিধানও।

এই রায় চমকে দিয়েছে অনেককেই। অতি রক্ষণশীল দেশ হিসেবে বরাবর পরিচিত আয়ার্ল্যান্ড। এখানকার ক্যাথলিক সমাজ সব সময় দূরে সরিয়ে রেখেছে সমকামী বিয়ে বা গর্ভপাতের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আয়ার্ল্যান্ডে সমকামিতা ছিল আইনত অপরাধ। ২০১০ সালে বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর সেনেটে বিল পাশ করে শুধু সমকামীদের একসঙ্গে থাকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু ক্যাথলিকদের চাপে সমকামী বিয়ের বিষয়টি এ পর্যন্ত ধামাচাপাই পড়েছিল।

সমকামী বিয়ে এখন বৈধ বিশ্বের অনেক দেশেই। এ সপ্তাহেই নিজের দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে বিয়ে করেছেন লাক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রী জেভিয়ার বি মাসিয়ের। তালিকা তো শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়। গায়ক এলটন জন থেকে শুরু করে টেনিস তারকা মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা—সমকামী সঙ্গীদের বিয়ে করে নতুন চিন্তাধারার পথ খুলে দিয়েছেন এমন অনেক সেলিব্রিটিই। আমেরিকার সব জায়গায় না হলেও আপাতত ৩৮টি রাজ্যে সমকামী বিয়ে বৈধ।

● **৪৫৮ আরোহী নিয়ে উলটে গেল চীনা তরি :**

ঘূর্ণিঝড় আর প্রবল বৃষ্টিতে ১ জুন চীনের ইয়াঙ্গসি নদীতে ৪৫৮ জনকে নিয়ে উলটে গেল একটি প্রমোদতরি। স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু পরের দিন সকালেও আবহাওয়া খারাপ থাকার ফলে উদ্ধার কাজ খুব একটা এগোয়নি সেদিন।

দুর্ঘটনার পর পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও উদ্ধার কাজ অব্যাহত ছিল। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে মাত্র ১৪ জনকে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত প্রমোদতরি 'ইস্টার স্টার'-এর ক্যাপ্টেনও। এর আগের সপ্তাহে ২৮ মে নানজিঙ্গ প্রদেশ থেকে দুপুর সওয়া একটা নাগাদ রওনা দিয়েছিল প্রমোদতরিটি। ৪০৬ জন যাত্রী, পাঁচ জন গাইড এবং ৪৭ জন জাহাজকর্মী নিয়ে চঙ্গকুইঙ্গ প্রদেশে পৌঁছানোর কথা ছিল জাহাজটির। কিন্তু তার আগেই ১ জুন রাতে হুবেই প্রদেশে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে আটকে পড়ে। সেখান থেকে বেরোনো আর সম্ভব হয়নি।

● **কিউবাকে রেহাই :**

'সন্ত্রাসে মদতদাতা রাষ্ট্রের' তালিকা থেকে কিউবার নাম তুলে নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত ডিসেম্বরেই বারাক ওবামা বিদেশমন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করেন, কিউবাকে 'সন্ত্রাসে মদতদাতা রাষ্ট্রের' তালিকা থেকে তুলে নেওয়া হোক। মার্কিন কংগ্রেসও জানিয়ে দেয়, প্রেসিডেন্টের এই প্রস্তাবে তারাও সহমত। বিদেশসচিব জন কেরি ৩০ মে জানান, সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে মদত দেয়নি কিউবা। ফলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।

● **নাইরেজিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট বুহারি :**

প্রাক্তন সেনা শাসক মহম্মদু বুহারি ৩০ মে নাইরেজিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতার পর নাইজেরিয়ার ইতিহাসে তিনিই প্রথম বিরোধী নেতা যিনি স্বতন্ত্র ভোটে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টের পদে জয়ী হয়েছেন। এ দিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বুহারি জানান, তিনি মানুষের জন্যই রয়েছেন। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক নাইজেরিয়ায় দুর্নীতি এবং সেনা বিদ্রোহের বিষয়গুলিও গুরুত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এই দেশ

● **নয়া সিভিসি, সিআইসি :**

দেশের মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনার (সিভিসি) পদে নিয়োগ করা হল কে ভি চৌধুরীকে। তিনি কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের প্রাক্তন অধিকর্তা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়্গের যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই নিয়োগ।

দেশের নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার (সিআইসি) নিয়োগ করা হয়েছে বিজয় শর্মাকে। এছাড়া, ইন্ডিয়ান ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান টি এম ভাসিন ভিজিল্যান্স কমিশনার হয়েছেন। সিভিসি, সিআইসি-র পদগুলি প্রায় নয় মাস ধরে ফাঁকা পড়ে ছিল।

● **জুলাইয়েই ছিটমহল বিনিময়, তিস্তা নিয়ে ঘরোয়া কমিটি :**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঢাকা থেকে দিল্লি ফেরার পথে বিশেষ বিমানেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন বিদেশসচিব এস জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি নৃপেন্দ্র মিশ্র। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলাদেশ সফর শেষ হয়ে গিয়েছে মানেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এমন নয়—প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যে দশটি চুক্তি হয়েছে, তার কাজ সেদিন থেকেই শুরু করে দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত হয়েছে, ছিটমহল বিনিময়ের কাজ জুলাইয়ের মধ্যেই রূপায়িত করতে হবে। ৩১ জুলাই 'অ্যাপয়েন্টেড ডে' হিসেবে ধরে কাজ শুরু করা হচ্ছে। ওই চুক্তির ফলে প্রায় আটশো পরিবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসবে বলে অনুমান। নভেম্বরের মধ্যে

সেই পরিবারগুলির পুনর্বাসন সেরে ফেলার পাশাপাশি সীমান্তে বেড়া লাগানোর কাজ মিটিয়ে ফেলতে চাইছে ভারত। স্থলসীমান্তের পাশাপাশি তিস্তা নিয়ে জট কাটানোর লক্ষ্যে তৎপর হয়েছে দিল্লি। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ঘরোয়া কমিটি গঠন করা হচ্ছে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অজিত ডোভাল ও নৃপেন্দ্র মিশ্র থাকবেন। ওই কমিটিতে সিকিম সরকারের প্রতিনিধিদের রাখার বিষয়েও ভাবা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা গওহর রিজভির সঙ্গে ঘরোয়া স্তরে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে ভারত। উদ্দেশ্য শেখ হাসিনার ভারত সফরের আগেই বিষয়টি মীমাংসা করে ফেলা। বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলসীমান্ত চুক্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শর্ত সাপেক্ষে সায় দিয়েছিলেন।

● **৩ অফিসার-সহ নিখোঁজ উপকূলরক্ষীবাহিনীর বিমান :**

৩ অফিসার-সহ নিখোঁজ হল উপকূলরক্ষীবাহিনীর একটি বিমান। ৮ জুন রাতের ঘটনা।

উপকূলরক্ষীবাহিনীর তরফে খবর, সেদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওই ডর্নিয়ার বিমানটি চেন্নাই থেকে আকাশে ওড়ে। বিমানে ছিলেন পাইলট ডেপুটি-কম্যান্ড্যান্ট বিদ্যা সাগর, কো-পাইলট ডেপুটি-কম্যান্ড্যান্ট সুভাষ এবং অবজার্ভার ডেপুটি-কম্যান্ড্যান্ট এন কে সোনি। উপকূলরক্ষীবাহিনীতে এই বিমানটিকে ২০১৪-তেই ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল।

ওই দিন রাত ৯টা থেকে ৯টা ২৩ পর্যন্ত তিরুচিরাপল্লির কাছে শেষ বারের মতো র‍্যাডারে বিমানটিকে দেখা গিয়েছিল। তার পরে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও আর কোনও খোঁজ মেলেনি।

নিখোঁজ বিমানটির খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। এই নিয়ে এ বছরে উপকূলরক্ষীবাহিনীর দু'টি বিমান নিখোঁজ হল। এর আগেরটি গত মার্চ মাসে নিখোঁজ হয় গোয়ার কাছে।

এই রাজ্য

● **মাদার ডেয়ারির নতুন নাম বেঙ্গল ডেয়ারি :**

রাজ্য সরকারি দুধ-সংস্থা মাদার ডেয়ারিকে এবার লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সংস্থার নামও পালটে হল বেঙ্গল ডেয়ারি। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১৯৭৮-এ পত্তন হওয়া ইস্তক মাদার ডেয়ারি ছিল ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এনডিডিবি)-এর অধীন। ১৯৯৬-এ এনডিডিবি তাকে রাজ্যের হাতে তুলে দেয়। তখন থেকে সংস্থাটি রাজ্য সরকারের পশুপালন দফতরের অধীনে। কিন্তু লোকসানে জীর্ণ সংস্থাকে ভরতুকি জোগাতে জোগাতে সরকারকে নাজেহাল হতে হচ্ছিল। ক'দিন আগে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও কাঁচামাল ও গুঁড়ো দুধের দাম বেড়ে যাওয়ায় মাদার ডেয়ারি ফের লোকসানের মুখে পড়ে। তবে গত এপ্রিল থেকে তা লাভের মুখ দেখছে। ওই মাসে মাদার ডেয়ারি মুনাফা করেছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। মে-তে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

● **সিআইআই-এর স্মার্ট সিটি প্রকল্প ঠাঁই নেই রাজ্যের :**

মূলত তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাকে হাতিয়ার করে স্মার্ট সিটি তৈরির প্রকল্পে জাতীয় বণিকসভা সিআইআই-এর প্রাথমিক পরিকল্পনায় ঠাঁই পায়নি পশ্চিমবঙ্গ। মডেল স্মার্ট সিটি তৈরি করতে সিআইআই চিহ্নিত করেছে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও অন্ধ্রপ্রদেশকে।

সিআইআই প্রেসিডেন্ট তথা ট্রাক্টর্স ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রধান সুমিত মজুমদার ২১ মে কলকাতার সাংবাদিকদের জানান, বণিকসভার মুখ্য কর্মসূচির তালিকায় রয়েছে স্মার্ট সিটি, ডিজিটাল ভারত ও স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প। তবে প্রাথমিক প্রকল্পে জায়গা করে নিয়েছে অন্য তিন রাজ্য। অবশ্য স্মার্ট সিটি প্রকল্পে এ রাজ্য ব্রাত্য নয় বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত তিন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনায় জমি পাওয়া কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

● **বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার হাল ফেরাতে কমিটি :**

গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের কারণে রাজ্যজুড়ে গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছে। ফলে বাড়ছে বিদ্যুৎ বিক্রির ব্যবসাও। কিন্তু ব্যবসা বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ঘরে সারা বছরই নগদের টানাটানি। খাতায়-কলমে ব্যবসার বহর বাড়লেও, নানা কারণে ফাঁক গলে বেরিয়ে যায় লাভের গুড়। বিদ্যুৎ বিলের আদায় বাড়াতে তাই পৃথক 'মনিটরিং সেল' তৈরি করছেন বণ্টন কর্তৃপক্ষ। যার কাজ হবে সংস্থার বিভিন্ন গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের লোকসান কমিয়ে আয় বৃদ্ধির রাস্তা খুঁজে বার করা।

সম্প্রতি বণ্টন সংস্থার পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে এই 'মনিটরিং কমিটি'-র প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়েছে বলে সংস্থা সূত্রে খবর। একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে মাথায় রেখে আট জন সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। যাঁদের উপরে আবার থাকবেন বণ্টন সংস্থার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর।

অর্থনীতি

● **নতুন ব্যবসার হাতছানি 'স্বচ্ছ ভারত'-এ :**

স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির হাত ধরে খুলে যাচ্ছে ব্যবসার নতুন দরজা। লগ্নি করতে ঝাঁপাচ্ছে ছোট-বড় সংস্থা। পুঁজি জোগাতে আগ্রহ দেখাচ্ছে উদ্যোগপুঁজি সংস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা। এমনকী ব্যবসার নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে শৌচাগারের দৌলতেও!

গ্রামে শৌচাগার তৈরির জন্য ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। শহরে শৌচাগার ও বর্জ্য নিকাশির জন্য বরাদ্দ ৬২ হাজার কোটি। সব মিলিয়ে এই দু'লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ নতুন বাজার তৈরি করছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। বিশেষত যেখানে খোলা আকাশের নীচে মলত্যাগে ভারতের পরিসংখ্যান এখনও মলিন। বিশ্বের ৬০ শতাংশ এ ধরনের কাজ এখানেই ঘটে। এগারো কোটির বেশি বাড়িতে শৌচাগার নেই। মেয়েদের জন্য তা নেই ১০ শতাংশ স্কুলেও। বিশাল এই ঘাটতির অঙ্কেই নতুন ব্যবসার লাভের হিসেব লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে করছেন বিনিয়োগকারীরা।

● **আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ শুনতে এজেন্সি গড়ছে কেন্দ্র :**

আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য একটি এজেন্সি গড়তে চায় কেন্দ্র। তার বিভিন্ন

বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং মতামত জানানোর জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক।

ইতিমধ্যেই এই 'ফাইন্যানশিয়াল রিড্রেস এজেন্সি' (এফআরএ) গড়ার প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে কেন্দ্র। টাস্ক ফোর্স সেই কাজেই অর্থ মন্ত্রককে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছে তারা। এর নেতৃত্বে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রাক্তন পিএফআরডিএ চেয়ারম্যান ডি স্বরূপকে। আগামী এক বছরের মধ্যে তাদের কাজ শেষ হবে বলে আশা। তিনি ছাড়াও টাস্ক ফোর্সে আরও তিন জন সদস্য এবং ছ'জন আমন্ত্রিত প্রতিনিধি থাকবেন।

সারা দেশ জুড়ে আর্থিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আসে। তাদের সবক'টিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসাই এজেন্সি গড়ার লক্ষ্য। দেশ জুড়ে কম অর্থের বিভিন্ন পরিষেবার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে কাজ করবে এই এজেন্সি।

● **আর্থিক বৃদ্ধি ছাড়াল চীনকে :**

চীন ৭, ভারত ৭.৫। জানুয়ারি থেকে মার্চে শতাংশের হিসেবে আর্থিক বৃদ্ধির দৌড়ে ভারতীয় অর্থনীতির এগিয়ে যাওয়ার এই খতিয়ানই ৩০ মে দিয়েছে সরকারি পরিসংখ্যান। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের শেষ তিন মাসে এশিয়ার সবচেয়ে বড় অর্থনীতি চীনকে ভারত টপকে যাওয়ায় স্বভাবতই খুশি অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

● **দ্বিতীয়, চতুর্থ শনিবার বন্ধ সব ব্যাংক :**

এবার থেকে সারা দেশেই মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার বন্ধ থাকবে সমস্ত ব্যাংক। আর পুরো সময় খোলা থাকবে বাকি শনিবারগুলিতে। ফলে এতদিন ধরে প্রতি শনিবার অর্ধ-দিবস ব্যাংক বন্ধ থাকার যে নিয়ম চালু ছিল, তা এবার উঠে গেল।

২৫ মে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়াও কিছু বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকের জন্য যে-নতুন বেতন সংশোধন চুক্তি সই হয়েছে, তাতেই ওই শর্ত রাখা হয়েছে। তবে যে-সব বিদেশি ও বেসরকারি ব্যাংক চুক্তির আওতায় নেই, এই নিয়ম তারা মানবে কি না, তা নিয়ে তখন সংশয় ছিল। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক জানিয়ে দিয়েছে, সব ব্যাংকেই এ ব্যাপারে একই নিয়ম চালু করতে হবে।

● **সেবি-র নতুন কমিটিতে মূর্তি :**

নতুন সংস্থা বা স্টার্টআপ ও বিভিন্ন ধরনের বিকল্প লগ্নির জন্য নতুন নিয়ন্ত্রক গড়তে ১৮ সদস্যের কমিটি তৈরি করল সেবি। এর চেয়ারপার্সন পদে আনা হয়েছে ইনফোসিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তিকে। নীতি সংক্রান্ত পরামর্শ দেবে এই কমিটি।

● **চীনে শাখা খুলল আইসিআইসিআই ব্যাংক :**

চীনে তাদের প্রথম শাখাটি চালু করে দিল ভারতের বেসরকারি ব্যাংক আইসিআইসিআই। চীন সফর চলাকালীন ২১ মে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সে দেশের সাংহাইতে তাদের এই শাখাটি খোলার জন্য গত মার্চেই সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। আপাতত সেখানে কাজ করবেন ১৭ জন কর্মী।

● **ভারত-ইউরোপ অবাধ বাণিজ্য চুক্তি :**

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সই হলে দ্বিগুণ হবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য। এক ধাক্কায় তা পৌঁছে যাবে ২০ হাজার কোটি ইউরোয় (প্রায় ১৪ লক্ষ কোটি টাকা)।

ভারতে ইইউ-এর রাষ্ট্রদূত জোয়াও ক্র্যাভিনহো এ কথা জানিয়ে বলেছেন, জুন মাসেই এই সংক্রান্ত আলোচনা ফের শুরু হবে। তাঁর দাবি, ভারতের সঙ্গে ইউরোপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও ভালো হচ্ছে। তাই অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত কথাও দ্রুত এগোবে।

এখন ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি ইউরো। ক্র্যাভিনহো জানান, গত এক দশকে তিনগুণ বেড়ে এবার তা ২০ হাজার কোটির দিকেই এগোচ্ছে। তবে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা কতটা সফল হয়, তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে বলে অভিমত তাঁর। সম্প্রতি ইইউ-এর বণিকসভাগুলির পরিষদের এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি।

● **লক্ষ্য ছুঁল রাজস্ব ও রাজকোষ ঘাটতি :**

গত ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে সরকারের রাজকোষ ও রাজস্ব, এই দুই ঘাটতিই তার লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে নেমে গেল আরও নীচে। তবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র।

অর্থমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজকোষ ঘাটতি (সরকারের আয়-ব্যয়ের ফারাক) দাঁড়িয়েছে জাতীয় আয়ের ৪ শতাংশ। লক্ষ্য ছিল ৪.১ শতাংশ। আর রাজস্ব ঘাটতি (আয় লক্ষ্যের থেকে কত কম) হয়েছে ২.৮ শতাংশ। লক্ষ্য ছিল ২.৯ শতাংশ।

অন্যদিকে, গত অর্থবর্ষে কেন্দ্রের মোট কর আদায় তার আগের বছরের থেকে ৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১২,৪৫,০৩৭ কোটি টাকা। জানানো হয়েছে, এই অঙ্ক সরকারের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২,২৮৮ কোটি টাকা কম।

● **নতুন আয়কর রিটার্ন ফর্ম :**

আয়কর রিটার্ন জমার নতুন তিন পাতার ফর্ম ৩১ মে প্রকাশ করে তা অনেকটাই সরল হয়েছে বলে দাবি করল অর্থমন্ত্রক। আয়কর-দাতাদের এই ফর্মে বিদেশযাত্রা ও লেনদেন না-হয়ে পড়ে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য দিতে হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি, আয়কর রিটার্ন জমার শেষ তারিখও বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩১ আগস্ট। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মিলবে নতুন ফর্ম।

নতুন ফর্মে তা বাড়তি তথ্য হিসেবে দাখিল করতে হবে পাসপোর্ট নম্বর ও চালু থাকা সব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য। তবে গত তিন বছরে লেনদেন হয়নি, এমন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য আয়কর-দাতাকে দাখিল করতে হবে না।

● **ব্রিটেনের রেটিং নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক করল এস অ্যান্ড পি :**

ব্রিটেনের রেটিং নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদল করল আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা এস অ্যান্ড পি। তারা জানিয়েছে, এই দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক করা হল, যার ফলে কমবে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা। এত দিন তা ছিল সর্বোচ্চ স্তর 'এএএ'-তে। ২০১৭ সালের মধ্যে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে, না এই গোষ্ঠী ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, তা নিয়ে গণভোট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মত বদল।

উল্লেখ্য, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ইউরোপীয় ইউনিয়নে থেকে যাওয়ারই পক্ষপাতী। কিন্তু অনেক সাংসদই তা চান না।

সংসদে তাঁর দলের গরিষ্ঠতাও সংখ্যার বিচারে খুব বেশি নয়। এই কারণে এস অ্যান্ড পি মনে করছে, ব্রিটেন যদি শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে রাজকোষ ঘাটতি কমানো ও বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ মেটানো কঠিন হবে। তাই দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে তারা।

● **শিল্পে আশার আলো :**

শিল্পে বৃদ্ধি প্রত্যাশা ছাপালেও, দুশ্চিন্তা বাড়াল মূল্যবৃদ্ধি। অর্থনীতির ছন্দে ফেরার পথে তা কাঁটা হিসেবে দোসর হল খরার সম্ভাবনার সঙ্গে।

কেন্দ্রের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এপ্রিলে শিল্প বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৪.১ শতাংশ। মার্চ মাসের ২.৫ শতাংশের তুলনায় তো বটেই, বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাসের তুলনাতেও তা অনেকটাই বেশি।

কিন্তু কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মে মাসে খুচরো মূল্যবৃদ্ধি পৌঁছেছে ৫.০১ শতাংশে। এপ্রিল মাসের ৪.৮৭ শতাংশের তুলনায় যা কিছুটা বেশি।

● **কৃতিত্ব ভারতের :**

ব্যাংকিং শিল্প, শেয়ার বাজার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার প্রশংসা অর্জন করল রিজার্ভ ব্যাংক ও সেবি। আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামো নিয়ে মূল্যায়নে ৬টি দেশের সর্বোচ্চ নম্বর জুটেছে। আর সেই তালিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীনকে পিছনে ফেলে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। এক সারিতে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, হংকং, জাপান, সিঙ্গাপুর।

● **বিশ্বব্যাংকের হুঁশিয়ারি :**

দুনিয়া জুড়ে অর্থনীতি নিয়ে হতাশার ছবিই তুলে ধরল বিশ্বব্যাংক। আর, সেই সঙ্গেই ভারতের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে কঠিন সময়ের জন্য কোমর বাঁধতে বলল এই আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থা। এর কারণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদ বাড়ার সম্ভাবনা ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠার দিকেই ইঙ্গিত করেছে তারা। যার প্রভাবে বাড়বে এই সব দেশের আন্তর্জাতিক ঋণ নেওয়ার খরচ, কমবে শেয়ার বাজারে বিদেশি আর্থিক সংস্থার লগ্নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির হারও কাটছাঁট করেছে বিশ্বব্যাংক।

২০১৫ সালের জন্য জানুয়ারিতে বিশ্ব অর্থনীতির ৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিলেও এখন তা কমিয়ে ২.৮ শতাংশ করেছে বিশ্বব্যাংক। দুনিয়া জুড়ে আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে 'গ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস' শীর্ষক রিপোর্ট পেশ করে বিশ্বব্যাংকের মুখ্য অর্থনীতিবিদ (ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রাক্তন প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা) কৌশিক বসু এ কথা জানিয়েছেন। এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদ বাড়ানোর পথে এগোনো ছাড়াও বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম গত বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ পড়ে যাওয়াকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কৌশিকবাবু। তিনি জানান, এই জন্যই সংশ্লিষ্ট রফতানিকারী দেশগুলি মার খেয়েছে।

● **পরিকাঠামোয় লগ্নি প্রস্তাবের অঙ্কে শিরোপা ভারতকে :**

পরিকাঠামোয় বেসরকারি লগ্নির প্রতিশ্রুতি আদায় করেই বিশ্বের প্রথম ৫টি দ্রুত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের তালিকায় জায়গা করে নিল ভারত। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুসারে এই পাঁচটি দেশ হল : ব্রাজিল, তুরস্ক, পেরু, কলোম্বিয়া ও ভারত। বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও জল সরবরাহের মতো পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ২০১৪-তে বেসরকারি লগ্নির প্রস্তাব নিয়ে করা এই সমীক্ষায় ১৩৯টি এ ধরনের দেশকে রাখা হয়েছে। তবে ২০১৪ সালে এই প্রতিশ্রুত লগ্নির অঙ্ক ৬২০ কোটি ডলার বা ৩৯,৬৮০ কোটি টাকা। আগের বছরের তুলনায় তা কম হলেও প্রশংসার দাবি রাখে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

বিশ্বব্যাংকগোষ্ঠীর সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ সংক্রান্ত প্র্যাকটিস ম্যানেজার ক্লাইভ হ্যারিস বলেন যে এই ৫টি দেশ ২০১৪ সালে ৭৮০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, যা শিল্পায়নের বিচারে দ্রুত উপরের দিকে উঠে আসা রাষ্ট্রগুলিতে আসা মোট লগ্নি প্রস্তাবের ৭৩ শতাংশ। ১৩৯টি দেশে আসা মোট লগ্নি প্রস্তাব ১০,৭৫০ কোটি ডলার। মূলত ব্রাজিলেই বেশি লগ্নির প্রস্তাব এসেছে বলে দাবি করা হয়েছে সমীক্ষায়। তবে চীনে প্রস্তাবের অঙ্ক ২৫০ কোটি ডলার, যা গত ২০১০ সালের পর থেকে সবচেয়ে কম।

● **বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ঘাটতি কমল :**

রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে চলতি খাতে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ঘাটতি জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে কমে হয়েছে ১৩০ কোটি ডলার বা ৮৩২০ কোটি টাকা, যা জাতীয় আয়ের ০.২ শতাংশ গত এক বছরে তা সবচেয়ে কম। বিশ্ববাজারে তেলের কম দামের জেরে বাণিজ্য ঘাটতি কমা এর অন্যতম কারণ।

● **নতুন আর্থিক সংস্কার পরিকল্পনা পেশ গ্রিসের :**

এবার ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে নতুন আর্থিক সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করল ঋণের ভারে জর্জরিত গ্রিস। সময়ে ঋণ মেটানো না-গেলে পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সিস সিপ্রাস। তার পরই এই পরিকল্পনার প্রস্তাব রাখল ইউরোপীয় দেশটি।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ) এবং ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের (ইসিবি) কাছে প্রায় ৮০০ কোটি ডলারের ঋণ বাকি পড়ে রয়েছে গ্রিসের। চলতি মাসেই যার মেয়াদ ফুরানোর কথা। সময়ে তা না-মেটালে ফের একবার সমস্যায় পড়বে ঘোরতর আর্থিক সংকটে পড়া গ্রিস। এ জন্য ইউরোপীয় কমিশন নিজের প্রস্তাব পেশ করলেও, গ্রিস তা পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছিল। কিন্তু এবার নিজে থেকেই সংস্কারের সুপারিশ পেশ করতে বাধ্য হল তারা।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **একা মঙ্গলযান :**

৮ থেকে ২২ জুন, এই পনেরো দিন পৃথিবী ও মঙ্গলযানের পথ আগলে থাকবে সূর্য। তাই 'ব্ল্যাকআউট'। দিন ১৫ পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না। নিজের দেখভাল নিজেই করবে 'মঙ্গলযান'। এ কথা ঘোষণা করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একা একা নিজের দেখভাল করতে পারবে মঙ্গলযান? ইসরো জানিয়েছে, এ ক'টা দিন 'অটোনোমাস মোড' অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় অবস্থায় থাকবে যানটি। যে কোনও সিদ্ধান্ত সে নিজেই নেবে।

● **'স্পেস পাইওনিয়র' অ্যাওয়ার্ড পেল ইসরোর মঙ্গল অভিযান :**

২০১৫-র 'স্পেস পাইওনিয়র' অ্যাওয়ার্ড পেল ইসরোর মঙ্গলযান মিশন। ইউএস ন্যাশনাল স্পেস সোসাইটি-র তরফে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। ইসরো সূত্রে খবর, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে তাদের।

● **মার্স রোগ আরও ছড়াতে পারে, আশঙ্কা হু-র :**

মার্স আরও ভয়াবহ চেহারা নিতে পারে। ১৪ জুন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্সের প্রকোপ 'অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল'। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে মার্স বা মিডিল ইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোমের ভাইরাস। বন্ধ রয়েছে বহু স্কুল। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ১৪ জন। আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৮। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা।

২০১২ সালে সৌদি আরবে প্রথম ছড়িয়েছিল মার্স। সৌদি আরবের বাইরে দক্ষিণ কোরিয়াই প্রথম, যেখানে মার্সের প্রভাব এত বেশি। মার্সের কারণ অনুসন্ধানে হু-র বিশেষজ্ঞরা তৈরি করেছিলেন একটি প্যানেল। সেই প্যানেলের তরফে কেজি ফুকুডা জানিয়েছেন, প্রশাসনের গাফিলতির জন্যই এই হাল। মার্সের ভাইরাস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল না প্রশাসনের। তাঁর মতে, দক্ষিণ কোরিয়ার চিকিৎসকেরা প্রাথমিকভাবে এই রোগটিকে চিনতেই পারেননি। তিনি আরও জানিয়েছেন, মার্স রুখতে হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোও ছিল না। একই ঘরে থাকতেন বহু রোগী। তাঁদের আত্মীয়রাও ঘুরে বেড়াতেন অনায়াসে। কেজির মতে এই সব কারণেই দক্ষিণ কোরিয়ায় অতি দ্রুত ছড়িয়েছে মার্স।

রোগ যত না ছড়িয়েছে, তার চেয়েও বেশি ছড়িয়েছে রোগ নিয়ে আতঙ্ক। শুধু ভাইরাস নয় এই আতঙ্কের সঙ্গেও লড়াই করতে হচ্ছে প্রশাসনকে।

● **সৌরালোকের চমক :**

সৌরালোক কবজা করে বাংলার গাঁ-ঘরে এবার তার থেকেও বড় চমক দিতে চলেছেন প্রবীণ সৌরবিজ্ঞানী শান্তিপদ গণচৌধুরী। একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের গবেষণায় নামমাত্র খরচ ও সরঞ্জামে গ্রামের ঘরে আলো জ্বালার এক কৌশল বার করে ফেলেছেন তিনি। দিনভর নামমাত্র আলোয় স্যাঁতসেঁতে ঘরে থেকে নানা ধরনের অসুখে কাবু গ্রামীণ জনতার জীবনে যা আশার আলো হয়ে উঠতে পারে। মাসখানেকের মধ্যে সুন্দরবন, বর্ধমান ও ত্রিপুরার মোট ৩০টি গ্রামে এমন আলো চালু করা হচ্ছে।

সরকারি সূত্রের খবর, চার লক্ষ টাকা খরচে সফল এই গবেষণায় এক-একটি ঘরে সরঞ্জামের খরচ পড়ছে বড়জোর ২০০ টাকা। একবার বসালে আলো জ্বলবে দশ বছর। তবে শুধু দিনেই জ্বলবে। রাতে আলো জ্বালাতে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

খেলার জগৎ

● **২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের বিডিং স্থগিত :**

রাশিয়া ও কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে জোড়া তদন্তের চাপে ২০২৬ বিশ্বকাপের বিডিং প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিল ফিফা।

ফুটবলের দুর্নীতি কলঙ্কিত বিশ্ব সংস্থার তরফে সেক্রেটারি জেনারেল জেরোম ভালকে এই ঘোষণা করেন।

২০১৮ বিশ্বকাপ হওয়ার কথা রাশিয়ায়। তার চার বছর পরে ফুটবলের মহোৎসব আয়োজনের দায়িত্ব অর্জন করেছে কাতার। কিন্তু এই দুই দেশই বিশাল অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে বিশ্বকাপের বিড জেতে বলে অভিযোগ। যা তদন্ত করে দেখছে সুইজারল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। একই সঙ্গে ফিফার ১৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছে। চার জন ইতিমধ্যেই অপরাধ স্বীকার করেছেন। এমনকী ভালকের বিরুদ্ধেও উঠেছে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে নতুন কোনও বিতর্ক এড়ানোর সেরা উপায় হিসাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের বিডিং-ই স্থগিত করে দিল ফিফা।

● **মার্সিডিস ওপেনে জয়ী বোপান্না-মার্জিয়া :**

মার্সিডিজ ওপেনের ডাবলস খেতাব জিতে নিলেন রোহন বোপান্না ও ফ্লোরিন মার্জিয়া। ফাইনালে সুপার টাইব্রেকারে বোপান্নারা ৫-৭, ৬-২, ১০-৭ হারালেন সুয়ারেজ-পেয়াকে।

● **এবারের ডেভিস কাপের ভারতীয় দল :**

জুলাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ডেভিস কাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। ডাবলসে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন রোহন বোপান্না এবং সাকেত মাইনেনির জুটি। চার সদস্যের দলে আছেন সোমদেব দেববর্মণ এবং ইউকি ভামব্রি। রিজার্ভ হিসেবে দলে আছেন নবাগত রামকুমার রমানাথন।

এবারের ডেভিস কাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন লিয়েন্ডার পেজ। পরিষ্কার করে কারণ না জানা গেলেও, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান এস পি মিশ্র জানিয়েছেন ব্যক্তিগত কারণে আসন্ন টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত পেজের। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে না থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরে ডেভিস কাপ খেলবেন বলে জানিয়েছেন জিশান আলি।

গত সেপ্টেম্বরে সার্বিয়ার বিপক্ষে শেষ বার ডেভিস কাপে দেখা যায় টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজকে। বেঙ্গালুরুতে সেই ম্যাচে ২-৩ সার্বিয়ার কাছে পরাস্ত হয় ভারত।

● **ইন্দোনেশিয়া ওপেনে কাশ্যপের লড়াই শেষ :**

ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার সিরিজের সেমিফাইনালে জাপানের মোমোতা কেন্তোর কাছে হেরে বিদায় নিলেন পারুপল্লি কাশ্যপ। পরপর দুই ম্যাচে অঘটন ঘটিয়ে সাড়া ফেলেছিলেন, কিন্তু শেষ চারের যুদ্ধে আর পারলেন না। অবশ্য এক ঘণ্টা এগারো মিনিট চলা সেমিফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তীব্র। শেষে কাশ্যপ হারলেন ২১-১২, ১৭-২১, ১৯-২১-এ। আগের দুই ম্যাচে বিশ্বের আট নম্বর, কোরিয়ার ওয়ান হো সন এবং বিশ্বের এক নম্বর, চীনের চেন লং-কে হারিয়েছিলেন তিনি। তবে ইন্দোনেশিয়া সুপার সিরিজে বিশ্বের এক নম্বরকে হারানোর পর বিশ্বের প্রথম দশে ঢুকে পড়লেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা পারুপল্লি কাশ্যপ।

● **এশীয় অ্যাথলেটিক্সে ভারত তৃতীয় :**

চীনের উহানে এশীয় অ্যাথলেটিক্সে ৪টি সোনা-সহ মোট ১৩টি পদক জিতল ভারত। সব মিলিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে যথাক্রমে চীন ও কাতার।

মেয়েদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে ইভেন্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন ললিতা বাবর। পেলেন রিও অলিম্পিকের টিকিটও। সোনা জিতলেন বিকাশ গৌড়া, ডিসকাস ৬২.০৩ মিটার

ছুঁড়ে। পিটি উষার ছাত্রী টিন্টু লুকা আন্তর্জাতিক মিটে প্রথম সোনা পেলেন ৮০০ মিটারে। অন্য সোনার পদকটি শট-পুটে জেতেন ইন্দ্রজিৎ সিং।

২০০ মিটারে ব্রোঞ্জ পেলেন শ্রাবণী নন্দা ও ধরমবীর সিং। পুরুষদের ৫ হাজার মিটারে ব্রোঞ্জ ও ১০ হাজার মিটারে রুপো জিতলেন তামিলনাড়ুর ২৫ বছরের দৌড়বাজ জি লক্ষ্মণন। এছাড়াও লিস্কি জোসেফ, এম আর পুভাম্মা ও জিনসন জনসন রুপো জেতেন।

বিবিধ সংবাদ

● **বামিয়ানে 'এক রাতের জন্য ফিরল' বুদ্ধমূর্তি :**

আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশের ১৫০০ বছরের পুরানো প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি ২০০১ সালের মার্চে ধ্বংস করেছিল তালিবান। ধূলিসাৎ হয়েছিল ইতিহাস। সেই ঘটনার ১৪ বছর পরে এক রাতের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল সেই মূর্তি। গত ৭ জুন চীনা দম্পতি জ্যানসন এবং লিয়ান ইউয়ের উদ্যোগে থ্রিডি আলোর মাধ্যমে বামিয়ানের উপত্যকায় ভেঙে যাওয়া মূর্তির শূন্যস্থানে ফের তৈরি করা হয় ওই মূর্তির প্রতিচ্ছবি। ওই দম্পতি জানিয়েছেন, মূর্তিটি আলোর মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করতে তাঁরা আফগান সরকার ও ইউনেস্কোর অনুমতি নিয়েছেন।

বিশাল বিশাল প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ওই মূর্তির অবিকল প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছিলেন চীনা দম্পতি। এমনকী, ওই ছায়া-ছবির উচ্চতাও রাখা হয়েছিল ১১৫ থেকে ১৭৪ ফুটের মধ্যেই। যা আসল মূর্তির প্রায় সমান।

● **অটল বিহারী বাজপেয়িকে সম্মান :**

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়িকে সম্মানিত করল বাংলাদেশ। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্রীবাজপেয়ি ছিলেন লোকসভার সদস্য। তখন তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জোরালো সওয়াল করেছিলেন। তাই তাঁকে 'ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার অ্যাওয়ার্ড' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে অটল বিহারী বাজপেয়ি অসুস্থ হওয়ায় তাঁর পক্ষে বাংলাদেশ যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বাংলাদেশ সফর চলাকালীন শ্রীবাজপেয়ির হয়ে এই সম্মান গ্রহণ করেন।

● **মারা গেলেন অর্থনীতিবিদ জন ন্যাশ :**

মারা গেলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জন ফোর্বস ন্যাশ। ২৩ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে এক ট্যাক্সি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী অ্যালিসিয়া। ন্যাশের বয়স হয়েছিল ৮৬, অ্যালিসিয়ার ৮২।

১৯৯৪ সালে যখন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ন্যাশকে, সেটা শুধু এক বিরাট আবিষ্কারের স্বীকৃতিই ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে এক গভীর খাদ থেকে উত্তরণের স্বীকৃতিও ছিল।

জন্ম ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার ব্লুফিল্ড শহরে। বিপুল প্রতিভার অধিকারী, উপন্যাসের মতো উত্থান-পতনসমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী ন্যাশ সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে আছেন ২০০১ সালে রন হাওয়ার্ড নির্মিত চলচ্চিত্র 'আ বিউটিফুল মাইন্ড'-এর নায়ক হিসেবে।

● **ব্রিটিশ অভিনেতা রন মুডির জীবনাবসান :**

১২ জুন জীবনাবসান হল ব্রিটিশ অভিনেতা রন মুডির। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ১৯৬৮ সালে চার্লস ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট' অবলম্বনে তৈরি 'অলিভার!'-এ ফ্যাজিনের ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। এই চরিত্রের জন্য পরে গোল্ডেন গ্লোব জেতেন। ডেভিড কপারফিল্ড, ক্যাপ্টেন হুক, শার্লক হোমসেও অভিনয় করেছেন।

● **ক্রিস্টোফার লি মারা গেলেন :**

জীবনাবসান হল হলিউডের জনপ্রিয় তারকা স্যার ক্রিস্টোফার ফ্র্যাঙ্ক কারান্ডিনি লি-এর। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন এবং ড্রাকুলার মতো ছবিতে কাজ করে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। শ্বাসকষ্ট নিয়ে তিনি লন্ডনের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ৭ জুন সকালে সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।

১৯৫৭ সালে হলিউডের 'দ্য কার্স অব ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' ছবিতে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেন লি। পরের বছর 'ড্রাকুলা' ছবিতে মুখ্য চরিত্র ড্রাকুলার ভূমিকায় অভিনয় করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান তিনি। পর পর বেশ কয়েকটি 'হরর' ছবিতে কাজ করার পর 'দ্য উইকার ম্যান', জেমস বন্ডের 'ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান', 'লর্ড অব দ্য রিঙ্গস', 'চার্লি অ্যান্ড দ্য চকলেট ফ্যাক্টরি'-র মতো নানা ছবিতে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন লি। একাধিক গানের অ্যালবামও বের করেন তিনি। ২০০৯ সালে নাটক ও সেবামূলক কাজের প্রতি অবদানের জন্য তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়।

● **পরীক্ষাকেন্দ্রে কারচুপি রুখতে 'ড্রোন' :**

পরীক্ষাকেন্দ্রে পড়ুয়াদের কারচুপি হাতেনাতে ধরতে চীনে অস্ত্র এবার 'ড্রোন'। যা কি না এতদিন অপরাধ ঠেকাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রের খবর, কয়েক বছর ধরেই পরীক্ষাকেন্দ্রে সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীরা এক ধরনের ওয়্যারলেস যন্ত্র ব্যবহার করছিল। মে মাসে এমন ২৩ জন পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে। এমনকী পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র বেচাকেনার মতো অপরাধও ঘটছিল সেখানে।

পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে এবং ভিতরে একইভাবে ড্রোন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হবে। তাতে পরীক্ষার সময় পড়ুয়াদের কারচুপি রোখা যাবে বলে মত চীনের শিক্ষামন্ত্রীর।

● **নিলামে লেননের হারানো গিটার :**

জন লেননের ব্যবহৃত গিবসন গিটার এবার নিলামে উঠতে চলেছে। আগামী ৬ ও ৭ নভেম্বর লস এঞ্জেলসের জুলিয়েন অকশনস-এ বসবে সেই নিলামের আসর।

ষাটের দশকে ব্রিটেন থেকে লেননের ওই গিটারটি খোয়া যায়। সত্তরের দশকে আমেরিকার সান দিয়েগোর অ্যামেচার গিটারিস্ট জন ম্যাকগ্র-র হাতে আসে সেটি। কয়েকশো ডলারের বিনিময়ে গিটারটি কিনেছিলেন বলে জানিয়েছেন ম্যাকগ্র। যদিও তিনি এর ঐতিহ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ❑

সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী